পরমার্থ প্রসঙ্গে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

পঞ্চম খণ্ড

বাণী সঞ্চয়ন ও সংকলন
শ্রীজগদীশ্বর পাল

পরমার্থ প্রসঙ্গে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

পঞ্চম খণ্ড

বাণী সঞ্চয়ন ও সংকলন
শ্রীজগদীশ্বর পাল

পশ্যন্তী প্রকাশনী
কলিকাতা - ৩

প্রকাশক
শ্রীজগদীশ্বর পাল
১০, গ্যালিফ স্ট্রীট
(স্যুইট নং ১৩, ব্লক নং ১)
কলিকাতা-৩

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৯১

—প্রাপ্তিস্থান—
১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

মূল্য ঃ ১০'০০ মাত্র

মুদ্রক
শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা-৪

নিবেদন

আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত দিব্য বাণী, যা তাঁর একান্ত ভক্ত ও অনুরাগী শ্রীজগদীশ্বর পাল মহাশয় সযত্নে টেপ্-রেকর্ডে সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন, তার থেকে খণ্ডে খণ্ডে পরমার্থ-প্রসঙ্গে নানা কথা ইতিপূর্বে তিনি প্রকাশ করেছেন এবং এখনও প্রকাশ ক'রে চলেছেন অদম্য উৎসাহে। বর্তমান সংকলনটি তার পঞ্চম খণ্ড। আচার্য-দেবের বাণী সম্বন্ধে কোনো পরিচায়িকা ভূমিকার কখনই কোনো প্রয়োজন নেই, তা সূর্যের দিকে দীপ তুলে ধরার মত হাস্যকর প্রয়াস। মন্দাকিনীর স্বচ্ছ ধারার মত তা আপন গতিতে স্বচ্ছন্দে প্রবহমান এবং তাতে যে কেউ যখন তখন অবগাহন ক'রে ধন্য হ'তে পারেন। তবে কখনো কখনো সে-গঙ্গার খরস্রোতে বা গভীর খাতে নিরাপদে ডুব দেবার জন্য একটি অবতরণিকার বা ঘাটের সোপানাবলীর হয় তো প্রয়োজন হয়। ভূমিকা হয়তো কিছুটা সে-প্রয়োজন সাধন করতেও পারে। তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপালের সনির্বন্ধ অনুরোধের উৎপীড়নে এখানে দু'চার কথা বলা।

পূজনীয় আচার্যদেব এমন একটি জ্ঞানের উত্তুঙ্গ ভূমিতে সদা সহজ স্থিতি লাভ করেছিলেন যে তার নাগাল পাওয়া আমাদের মত অজ্ঞানজর্জরিত লোকের পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার। সেইজন্য অনেক জায়গাতেই তাঁর লেখা বা বলা অবোধ্য বা দুর্বোধ্য। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞান। তিনি নানা শাস্ত্রের নানা তত্ত্ব অবলীলা-ক্রমে যেমন বলে যেতেন সেই সব শাস্ত্রের সঙ্গে আমাদের প্রায় কোনো পরিচয় না থাকার ফলে আমরা একেবারেই তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারি না কোনো কোনো স্থলে। এই খণ্ডেও শেষের দিকে "অখণ্ড মহাপ্রকাশ ও তাহার অভি-ব্যক্তির ক্রম" বা "তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনা" প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি যা প্রকাশিত হ'ল, তাতেও এই দুরূহতা আরও প্রকটভাবে অনেকের কাছে উপলব্ধ হ'বে। অনেক সময় তাঁর কাছে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত করলে তিনি তখনই সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলতেন ঃ "পরে লিখিয়ে দেব" এবং সে-ক্ষেত্রে ঠিক কথ্য ভাষার সারল্য বা ভাবপ্রকাশের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ যেন ব্যাহত হ'ত। এ খণ্ডেও মৌখিক ও লিখিত বাণীগুলির মধ্যে তারতম্য অনেকের কাছেই সহজে ধরা পড়বে। তবে শ্রীপাল তাঁর সব জিনিসই নির্বিচারে সকলের লাভ বা উপকার হ'বে ভেবে উপস্থাপিত করেছেন, নানা ব্যতিক্রম সত্ত্বেও।

এই খণ্ডের প্রারম্ভেই যে-আলোচনাটি নিবদ্ধ হ'য়েছে, সেটিতে একটু

অভিনিবিষ্ট হ'লে আমরা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত এই পরমার্থ-প্রসঙ্গের মূল লক্ষ্যটি হয় তো সামান্য ধরতে পারব। কথার পর কথায়, তা সে যত গভীর তত্ত্বকথাই হোক, কি লাভ যদি আমরা সংশয়ের পারে যেতে না পারি? তা যেতে হ'লে মৌনের সেই গভীরে প্রবেশ করতে হ'বে, যেখানে শব্দের আর কোনো তরঙ্গ নেই, সব নিথর শান্ত। "গুরু যখন কথা দিয়ে কথা বলতে যাবেন, তখন সংশয় থাকবেই," আচার্যদেবের এই উক্তির তাৎপর্য তাই আমাদের বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হ'বে। শব্দ যেন নানা বুদ্বুদ, অবিরাম নানা চিন্তার তরঙ্গ থেকে যা উদ্ভূত। যতই শুনি ততই তখনকার মত আমাদের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা শান্ত হ'লেও আবার পরক্ষণেই আর এক সংশয়, আশঙ্কা, নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এর যেন বিরাম নেই কোথাও। আচার্যদেবের কথায়ঃ "সংশয়টা হচ্ছে মন। যতক্ষণ মন আছে সংশয় থাকবে থাকবে থাকবে।.........ঢেউ উঠছে সেখানেতে। ঢেউ যেখানে থাকবে না, স্পন্দন যেখানে উঠবে না—নিস্পন্দ যেখানেতে, সেখানেতে মৌন—এটাই ব্যাখ্যা" (পৃষ্ঠা—১)। আবারও বলেছেন "কথা থাকলেই সংশয় থাকবে। সেখানে কথা নাই কিছু। সংশয়ের নিবৃত্তি হয়ে গেল" (পৃষ্ঠা ৩)।

সুতরাং পরমার্থ-প্রসঙ্গের কথার সূত্র ধরে আমাদের সব কথার পারে যেতে হ'বে। বারবার তাই তিনি কথা বলতে বলতে সচেতন করেছেন জিজ্ঞাসু শ্রোতাকেঃ "বুঝবার চেষ্টা কর। তা না হ'লে শব্দ থাকবে, symbol থাকবে, কিন্তু কি indicated হচ্ছে বুঝতে পারছ না" (পৃষ্ঠা ৭)। শব্দ থেকে অশব্দে যাওয়ার জন্য তিনি ইঙ্গিত করেছেন অবিরাম। নিজের অনুভবকে ভিত্তি ক'রে এগিয়ে যেতে বলেছেন, নইলে প্রাণের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ হ'বে না। সে-জ্ঞান পুঁথিপড়া জ্ঞান বা শোনা জ্ঞান মাত্র, নিজস্ব জ্ঞান নয়। বলেছেনঃ "আগে নিজের অবস্থা বুঝ এবং বল, তা না হলে কেবল শোনা কথা বলবে, এটা তোমার thesis লেখবার জন্য কাজে লাগবে, তোমার নিজের অনুভূতিতে কোনো কাজে লাগবে না" (পৃষ্ঠা ৬)। অনেক সময় ধমকের সুরেও বলেছেনঃ "Absolute বললে হবে না, নিষ্কল ব্রহ্ম বললে হবে না, পরাৎপর ব্রহ্ম বললে হবে না—শব্দ দিয়ে কি হবে তোমার? Absolute বলে শব্দ বললে তো পেট ভরবে না। Conceptionটা তো চাই" (পৃষ্ঠা ১৪)।

আমরা শব্দের জালেই আটকা পড়ে থাকি অথচ যে অহংবোধ সর্বপ্রাণি-সাধারণ, সকলের সহজাত সেই অহংকে ধরতে বা চিনতে গিয়ে আমরা গলদ্‌ঘর্ম হই। অনুভূতির সূত্র ধরে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম তা হ'লে

অহংয়ের স্বরূপ আচার্যদেব যেভাবে বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন (পৃষ্ঠা ৪-১৫), তার কিছুটা উপলব্ধি করা সম্ভব হ'ত। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" এই রহস্যোক্তির তাৎপর্যও কিছুটা উদ্ঘাটিত হ'ত, যার সম্বন্ধে আচার্যদেব বলেছেন : "এই কথার এত মূল্য যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড একত্র করলেও এর দাম দেওয়া যায় না" (পৃষ্ঠা ৭)।

এই বোধের বা অনুভবের অভাবেই আমরা সব কিছুকে এক সূত্রে গাঁথতে পারি না, integration বা সমন্বয় কাকে বলে তা বুঝি না। শ্রীগুরুর প্রণামে আমরা নিত্য "অখণ্ডমণ্ডলাকারং" উচ্চারণ করি অথচ "অখণ্ড মণ্ডল বলে কোন্‌টাকে ?" (পৃষ্ঠা ১৬) আমরা জানি না, বুঝি না। Integration-এর পূর্ণ ছবিটি যে ঐ মন্ত্রের মধ্যেই বিধৃত আছে, আমরা উপলব্ধি করি না। তেমনি গীতার "সূত্রে মণিগণা ইব"র তাৎপর্যও আমরা ধরতে পারি না। "একটা unityর মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য গাঁথা রয়েছে" (পৃষ্ঠা ১৯) তা-ও আমাদের দৃষ্টিতে আসে না। এই প্রসঙ্গেও আমাদের বোধকে সজাগ করার জন্য তিনি আবারও বলেছেন : "এইটা বুঝে নাও। খালি কতকগুলি কথার ভেলকিতে ভুলে যেয়ো না।" (পৃষ্ঠা ১৮)।

আমরা শিব, শক্তি ইত্যাদি কতকগুলি কথা শুনি মাত্র অথচ তন্ত্রের মূল তত্ত্ব আমরা কিছুই বুঝি না। "সৃষ্টি যে হয় উপাদান কে তার ?" (পৃষ্ঠা ২২)—এইভাবে সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত ক'রে না বুঝলে শিব, শক্তি, তাদের কার কোথায় প্রাধান্য-অপ্রাধান্য, কোথায় বা সামরস্য কিছুই বোঝা যাবে না। সেখানেও আবার উপসংহারে অহং-ইদংয়ের প্রসঙ্গেই ফিরে আসতে হয় (দ্রষ্টব্য : পৃষ্ঠা ২৪-২৫)।

তাই তিনি সব সময়ই জোর দিয়েছেন দৃষ্টি খোলার উপর। বলছেন : "আসল জিনিস হ'চ্ছে দৃষ্টি খোলা। দৃষ্টিটা না খুললে তুমি মঙ্গলে যাও, যেখানে যাও সংসারই। লাল কাপড় পরেছ বলেই কি তুমি সংসারী নও ?... বনে গিয়েও যদি তুমি বাড়ীর চিন্তা করো, খারাপ চিন্তা করো তা হলে তো তুমি সংসারীই তো রইলে। লাল কাপড় পরলেই যে তুমি ভগবানের বিশিষ্ট recognition পেয়ে গেলে, তা তো নয়। Transformation হলে entire outlook will change (পৃষ্ঠা ১৭)।" এই রূপান্তর বা transformation ঘটে যার মাধ্যমে তারই নাম দীক্ষা। বোধের সঙ্গে তাই দীক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সেটি তিনি বুঝিয়েছেন পৃষ্ঠা ২৫ থেকে ২৯এ বিধৃত কথাপ্রসঙ্গে। বলেছেন : "দীক্ষা জিনিসটা তো বোঝেই না লোকে। Formality করতে হয় করে। আসল জিনিস হচ্ছে সেই দীক্ষা না হলে তুমি পাবে কি

করে ?......তোমাকে শক্তি না দিলে তুমি যাবে কিসের জোরে ? (পৃষ্ঠা ২৮)।

আবার বাহ্য দীক্ষার কোনো প্রয়োজনও না হ'তে পারে, এ কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। "ভেতর থেকে যদি সে জিনিসটা খুলে যায় তা হলে দরকার না-ও হতে পারে। এই শুকদেব কে ছিল---সে শিশু অবস্থাতেও পূর্ণ জ্ঞান পেয়েছিল। সকলেই তা নয়। ভিতরে আসল যে দীক্ষাটা, সেটা নিতেই হবে।" (পৃষ্ঠা ২৯)।

এমনি ক'রেই তিনি বুঝিয়েছেন যথার্থ 'পরিত্রাণ' বলতে কি বুঝায়। ভগবান্ আমাকে বাঁচিয়ে দেবেন বা রক্ষা করবেন, এই ভরসাতেই আমরা তাঁর শরণাগত হই বা তাঁকে ডাকি। কিন্তু তিনি তাঁর নিয়ম বা শৃঙ্খলা বা lawএর দ্বারা কি আবদ্ধ নন ? তিনি তো কর্মফলদাতা। "আমি একটা কর্ম করলাম তার ফলটা তো ভোগ করতে হবে" (পৃষ্ঠা ৩১)। তা হ'লে তিনি কি ক'রে পরিত্রাণ করবেন আমাকে ? পরিত্রাণ আসলে সেখানেই যেখানে আমরা প্রেমের রাজ্যে উত্তীর্ণ হই। "তখন দেখবে যা কিছু হচ্ছে তাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে। সব ঠিক ঠিক হচ্ছে" (পৃষ্ঠা ৩১)। "নির্ভরের ভাবটা না আসলে এ জিনিসটা তো হয় না। বাইরে থেকে কষ্ট হচ্ছে, সে (ভক্ত) বলেঃ তিনি দিচ্ছেন, সংশোধন করছেন আমায়—সংশোধন করতে গিয়ে কত কি করতে হয়—তাতে কি হয় ?" (পৃষ্ঠা ৩২) আরও বোঝাবার জন্য বলেছেনঃ "মা ছেলেকে মারছে খুব অথচ ভেতরেতে স্নেহে পূর্ণ---বাইরের লোক বলছে, মের না। কিন্তু বাইরের লোকের থেকে কি মায়ের স্নেহ কম ? বাইরের থেকে বুঝবার উপায় নাই।" (পৃষ্ঠা ৩১)। তাই একথাও ঠিক যে "বাইরের লোক মনে করবে বাঃ তিনি ভক্ত (অথচ) খুব কষ্ট পাচ্ছেন। বাইরের লোকেরও দোষ নাই। তারা বাইরে থেকে দেখছে" (পৃষ্ঠা ৩১)।

আচার্যদেব তাই বারংবার আমাদের দৃষ্টিকে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যই পরমার্থ প্রসঙ্গ করেছেন। এই 'আবৃত্তচক্ষু' হওয়া, দৃষ্টির পরাবৃত্তিই সমস্ত অধ্যাত্ম সাধনার একমাত্র লক্ষ্য। তখন তারই ফলে কাম রূপান্তরিত হয় প্রেমে, উপলব্ধি হয় "কামও যা, প্রেমও তাই—একই জিনিস—অথচ এক নয়। যেমন আকাশ আর পাতাল। কামও যা প্রেমও তাই, অথচ একটা lowest, আর একটা highest" (পৃষ্ঠা ৩৪)। দুঃখ করে তাই আচার্যদেব বলেছেনঃ "আমাদের দেশে কত জিনিস ফুটে উঠেছে ! কিন্তু না বুঝতে পারলে কিছু হয় না—গৌরব কোথায় ?" (পৃষ্ঠা ৩৪)। বৃন্দাবন লীলা, গোপীদের প্রেমের কথা শুনলেও তাই

আমাদের কামনা-কলুষ চিত্তে শুধু বিকৃত যৌন লীলারই ছবি ফুটে ওঠে।

প্রয়োজন তাই মানুষের "যেটা প্রকৃত স্বরূপ সেই স্বরূপ প্রকাশ হওয়া।" সেই স্বরূপ প্রকাশের ধারাটি তিনি বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পৃষ্ঠা ৩৪ থেকে পৃষ্ঠা ৪৫ পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনায়। তার অনেক গহন গুহ্য স্তর —যেমন মাতৃকা, তা বিগলিত হয়ে নাদ, তার ফলে সহস্রদল কমলের উন্মীলন, উর্ধ্বগতি, সরল মার্গ, অর্ধমাত্রার পথ, শেষে উন্মনা অবস্থায় 'মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ'—আমাদের ধারণায় আসে না। কিন্তু একটি মূল জিনিস আমরা সকলেই সহজে বুঝতে পারি যখন আচার্যদেব আমাদের 'উপাসনার স্বরূপ' চিনিয়ে দেন ঃ "তুমি মা'র presenceটা feel করো, মা'র সন্নিহিত হ'য়ে আছো। মা'র দিকে উন্মুখ হয়ে—এটা থাকলে মা'র থেকে যে জিনিস আসবার সেটা automatically আসবে। মাতৃভাব নিয়ে তাঁর দিকে উন্মুখ হয়ে থাকলেই সন্তানের প্রতি উন্মুখভাব যেটা, সেটা মায়ের মধ্যে আসবেই। জোর ক'রে করতে হয় না। আপনা আপনিই হয়।" উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন ঃ "গাভীর স্তনেতে দুধ আছে। বাচ্ছাকে দেখলেই দুধটা অধোমুখ হ'তে চেষ্টা করে—ইচ্ছা ক'রে দিতে পারে না—ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো প্রশ্ন নাই সেখানে। Automatically হয়।……সমীপে বসাও (অর্থাৎ উপাসনাও) সেইরকম জিনিস" (পৃষ্ঠা ৪৬)।

এইভাবে নানা পরমার্থ-প্রসঙ্গে আচার্যদেব শ্রোতা বা জিজ্ঞাসুকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন সেই চৈতন্যের সমীপে বা সান্নিধ্যে, যেখানে ঘটে যথার্থ বোধন। তখন আর 'তিনি' বলে তাঁকে দূর থেকে পরোক্ষরূপে দেখি না, তিনি জাগ্রত, জীবন্ত হ'য়ে সামনে দাঁড়ান 'তুমি' হ'য়ে। আমি-তুমি তখন মুখোমুখি, তাঁকে তখনই ডাকতে পারি যথার্থভাবে সম্বোধন ক'রে 'ওহে' ব'লে। শেষে তুমি-আমি মিলে যায়। মধ্যম পুরুষ 'তুমি' উত্তম পুরুষ 'আমি'তে লয় পায়। তখন "মায়ের কোলে গেলে আর ভয় থাকে কোন কিছুর ? ভয় নাই। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি—যত রকমের পাপ আছে, মলিনতা আছে, ক্ষুদ্রতা আছে যাতে নাকি infiniteএর সঙ্গে যোগ দিতে পারে না সে সবগুলো আমি খণ্ডন করে দেব!……তোমার ভিতরে ময়লা আছে, আবরণ আছে, সেগুলো তিনি সরিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ মা তোমার ভিতরের সব ময়লা মাটি পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। সমস্ত পরিষ্কার করে যদি দেন তখন তুমি তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাবে" (পৃষ্ঠা ৬১)।

আচার্যদেবের উপদেশামৃত অবলম্বন ক'রে আমরা যদি এইভাবে উপা-

সনায় ব্রতী হ'তে পারি, ইষ্টের বোধন ঘটাতে পারি, তাঁকে সম্বোধন করার অধিকার লাভ করতে পারি তা হ'লেই তাঁর অনলস নিরবচ্ছিন্ন উপদেশামৃত বর্ষণ সার্থক হবে এবং তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যও সাধিত হ'বে। তিনি সারাজীবন ধরে চেষ্টা করেছেন মানুষের মধ্যে এই আস্তিক্য বোধ জাগাতে, জগতের মূলে এক 'সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা' মহাশক্তি বিরাজমান, তার দিকে সবাইকে উন্মুখ করতে, তার সান্নিধ্যে সবাইকে নিয়ে যেতে। তাই পাঠকমাত্রেই শাস্ত্রের পারিভাষিক জটিলতা বাদ দিয়েও যদি তাঁর সমস্ত উক্তির মূল সুরটি, আসল ধুয়াটি ধরতে পারেন, তা হলেই কৃতার্থ হবেন। সে ধুয়াটি হ'লঃ "ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো—তুমিই, দ্বিতীয় কিছুই নাই। মা ভাবতে পার, বন্ধু ভাবতে পার—সে-ই একমাত্র।" (পৃষ্ঠা ৬১)

অন্যান্য বারের মত এবারও টেম্পল্ প্রেসের শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু এবং সেখানকার কর্মীবৃন্দ, বিশেষ ক'রে শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় দ্রুত ও নির্ভুল ছাপার ব্যাপারে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন, এজন্য তাঁদের কাছে আমাদের একান্ত কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রেস কপি তৈরীর জন্য ডকটর শ্রীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। সকলের উপর আচার্যদেবের অমোঘ কল্যাণাশিষ বর্ষিত হোক্—এই প্রার্থনা।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা
অক্ষয়-তৃতীয়া
১৩৯১ বঙ্গাব্দ

মৌন ব্যাখ্যা

৭ই নভেম্বর, ১৯৭২

স্থান—শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম, বারাণসী

অধ্যাপক প্রবীর কুমার হুইয়ের প্রশ্নঃ গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ", এটা কি করে সম্ভব ?

উত্তর ঃ গুরু যখন কথা দিয়ে কথা বলতে যাবেন তখন সংশয় থাকবেই—বিকল্প এসে যায় যে। বিকল্প-শূন্য অবস্থা হওয়া চাই তো। বিকল্প-অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সংশয়ের অতীত হওয়া যায় না। সংকল্প এবং বিকল্প সঙ্গে সঙ্গে চলে—সংকল্প কম থাকে বা বিকল্প বেশী থাকে অথবা বিকল্প কম থাকে সংকল্প বেশী থাকে—তারপরে যখন নাকি বিকল্প একেবারেই থাকে না শুধু সংকল্প যেটা হয়ে ওঠে—সেটা হ'ল শুদ্ধ জ্ঞান—সেই অবস্থা যদি হয়ে যায় সেই অবস্থায় মৌন অবস্থা এসে যায়—সেটা বিকল্পশূন্য অবস্থা—তখন সৃষ্টি থাকে না। একটা বিরাট প্রকাশ থাকে—জ্যোতিঃপ্রকাশ। তখন মৌন ব্যাখ্যা আসে। সংশয়টা হচ্ছে মন। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ সংশয় থাকবে থাকবে থাকবে! কারণ লক্ষ কোটি বছর যদি ব্যাখা দেয় তাহলেও সংশয় থাকবে। মনের ধর্মই হচ্ছে সংশয়। সংকল্প-বিকল্পাত্মকং মনঃ। সংকল্প আর বিকল্প দুটো না প্রাপ্ত হলে মন হয় না। আর যখন নাকি বিকল্প থাকবে না, সংকল্প যখন শুদ্ধ হয়ে যাবে, নির্বিকল্প অবস্থা এসে যাবে। শুদ্ধ জ্ঞানের অবস্থা সেখানেতে, মন থাকে না। মন না থাকলে সেখানে সংশয় থাকে না—জগৎ থাকে না—একেবারে শান্ত অবস্থা, স্থিতিটা হয়ে যায়। স্বরূপে স্থিতি হয়—সেটা হচ্ছে বোধস্বরূপে স্থিতি। অর্থাৎ নিজস্বরূপে স্থিতি। গুরু-শিষ্য বলে দুটো জিনিষ থাকে না। অদ্বৈত অবস্থা সেটা। পরম স্থিতি। সেটা হচ্ছে গুরুর নিজের স্বরূপে স্থিতি। তখন শিষ্যও যে, গুরুও সেই—একটাই জিনিষ।

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং—এই মৌনই হচ্ছে ব্যাখ্যা। আগেকার তো কতরকম ব্যাখ্যা করা যায়—হাজার হাজার ব্যাখ্যা করা যায়। সবই বিকল্প তো—বিকল্প থাকলেই সেখানে সংকল্প-বিকল্প দুই-ই রয়েছে। ঢেউ উঠছে সেখানেতে, ঢেউ যেখানে থাকবে না, স্পন্দন যেখানে উঠবে না—নিস্পন্দ যেখানেতে, সেখানেতে মৌন—এটাই ব্যাখ্যা। স্থিতি তো এসে গেল। স্থিতি

এসে গেলেই দুয়ার খুলে গেল। ব্যাখ্যা তখন দিতে হয় না। সেটা নিজের স্বরূপের মধ্যেই আছে। জ্ঞান তো রয়েছে। যখন ঢেউ ওঠে—যখন তরঙ্গ ওঠে—যখন ঢেউ নাই তখন তো শুদ্ধ জ্ঞান। ঠিক সেই রকমের শুদ্ধ বোধ যেটা, সেটা আসে।

সেটা কোন সময়ে ? তরঙ্গশূন্য অবস্থা।......তরঙ্গটা—তারও বিভিন্ন অবস্থা আছে—সাত্ত্বিক আছে, রাজসিক আছে, তামসিক আছে। তামসিক অবস্থার মধ্যে নানারকমের আবরণ আছে। অনেক কিছু আছে—তারপরেতে রাজসিক অবস্থা আসে, তারপরেতে সাত্ত্বিক অবস্থা আসে। তারপরেতে নির্গুণ অবস্থা আসে। এই রকম হতে হতে তারপরেতে তরঙ্গগুলো শান্ত হয়ে আসে, তারপরেতে তরঙ্গ থাকেই না। তরঙ্গগুলোই হচ্ছে বিকল্প। তরঙ্গ-শূন্য হলে নির্বিকল্প হয়। কাজেই সেই সত্তাটা নির্বিকল্প হয়ে যায়। তখন মন কোথায় ? মন বুদ্ধি সংস্কার তখন কিছুই থাকে না। তখন প্রকাশস্বরূপ সত্তাটা থাকে। সেইটাই হচ্ছে নিজের স্বরূপ, নিজের সত্তা সেটা।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু গুরুর এই যে মৌন ব্যাখ্যান......

উত্তর ঃ যেটা সংশয় থাকে সেইটে তখন খুলে যায়। সেটা শব্দ দিয়ে খুলতে হয় না। তারপরে সেখান থেকে নেমে শব্দ দিয়ে খোলা যায়। সেটা আলাদা স্তর। গুরুকে আশ্রয় করে শব্দ দিয়ে খোলা যায়। সেটা অন্য জিনিষ। সেখানেতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। আর ওখানেতে সিঁড়ি দিতে হয় না। যেমন একটা ছোট ছেলেকে যে ক, খ, জানে না, তাকে যদি ক, খ শেখাতে হয় যে ক টা আগে না খ টা আগে, সেটা যেমন তোমাকে চিন্তা করতে হয় না, তুমি সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিতে পার। কিন্তু যে প্রথম শিখছে তাকে ভাবতে হয় 'ক' টা আগে না 'খ' টা আগে। তখন সে ক, খ, গ, ঘ পড়ে এবং ঠিক করে কোনটা আগে। এও ঠিক সেই রকমের। যখন নাকি শেষের স্থান স্পর্শ শেষ হয়ে যায় তখন বোধটা থাকে আর কিছুই থাকে না। সেইটেই হলো চিদাকাশ। আর আগে যেটা ছিল সেটা হল মহাকাশ। এখন যে শব্দ শোনা সেটা হল মহাকাশ—সেইটেই হল এই জগতের সৃষ্টি যখন হয়। In the beginning there was word, the word was with God and the word was God—বাইবেলের মধ্যে আছে এ শব্দটা। এই শব্দ সেই শব্দ বাক্! ব্যাহৃতি। এর নাম হচ্ছে ব্যাহৃতি—ব্যাহৃতি হচ্ছে শব্দ—বিকল্পাত্মক শব্দ। তারপর শব্দ থাকে না—নিস্পন্দ, মৌন। এইটাই হল স্বরূপে স্থিতি—বাগ্‌রূপ স্বরূপে স্থিতি। বাক্ থাকে না

তখন। বাক্‌ই তখন জ্ঞান হয়ে যায়। বাগ্‌দেবী মানেই জ্ঞানস্বরূপা সরস্বতী—সরস্বতীর স্বরূপ। এইটে ভিতরে যখন অনুভব করবে তখন পরাবাক্‌ সেটা। আমাদের দেশে আছে। গ্রীক দেশে ছিলো—সব দেশেই ছিল।

'গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ'—গুরু যখন কথা বলছিল তখন সংশয় থাকে—কথা বলা যখন বন্ধ হয়ে যাবে সে জায়গায় গেলে তখন আর শিষ্যের সংশয় থাকে না। কথা বলা হবে না কোন সময়েতে? বিকল্প-শূন্য অবস্থায় গেলে। আর বিকল্প-শূন্য অবস্থায় গেলে দুটো জিনিষ থাকবে না, একটা হয়ে যাবে। সেখানে সংশয় নাই—বিকল্পও নাই—কিছুই নাই। প্রকাশ একটা—অখণ্ড প্রকাশ। বোধটা আসা চাই। বোধটা আসে কোথা থেকে? এ বোধটা কি? এটা কোন বোধ? [আবার নিজেই উত্তর দিয়ে বল্লেন] এটাই হ'ল আকাশ—এটাকে চিদাকাশ বলে। আমরা যে আকাশটা নিয়ে ব্যবহার করি সেটা থেকে বিকল্প ওঠে। এই আকাশকে ভেদ করে চিদাকাশে যেতে হবে। চিদ্‌ আকাশ থেকে স্পর্শ আরম্ভ হয়ে যায়। চিদাকাশে গিয়ে শেষ হয়। নিস্পন্দ অবস্থা যেখানে হবে—নিষ্ক্রিয় স্থিতি হয় যেখানে—সংশয়শূন্য হবে। তারপর তুমি যেখানে চাও সেইখানেই পাবে। তারপর আর সংশয় করবে কি করে? কারণ সত্যটা প্রকাশ হয়ে গেছে কিনা। কাজেই তাকে আর বলার দরকার নেই। সত্য'র থেকে উপরে। সত্য যদি না পেতে তাহলে তো উল্টো পাল্টা হয়ে যায়। বিকল্প আসে কিনা সেখানেতে—এই হচ্ছে কথা।

প্রশ্ন ঃ এখানে কোন communication নাই তাহলে?

উত্তর ঃ কোথায়? বিকল্পহীন অবস্থা? হ্যাঁ communication আছে। গুরু যদি ইচ্ছা করেন ভিতর দিয়ে স্পর্শ করতে পারেন বা হাত দিয়ে মাথা স্পর্শ করতে পারেন, সেই রকম communication। মুখে কোন communication হয় না। মস্তকে স্পর্শ করলেন, ব্যস হয়ে গেল। অর্থাৎ জ্ঞানটা তার ভিতরে খুলে গেল। আমার ভিতরে যে জ্ঞানটা ছিল, সেই জিনিষটা তার ভিত্তরে প্রকাশ হ'ল। প্রত্যেকের ভেতরেই সেই জ্ঞানটা—সেই জিনিষটা আছে। তার উপরে পর্দা রয়েছে। স্পর্শ করলেই সেই পর্দাটা সরে যায়। তাকে বাইরে থেকে জ্ঞান দিতে হবে না—lecture দিয়ে জ্ঞান দিতে হবে না—তাকে উপদেশ দিতে হবে না। এখানেই গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ—কথা থাকলেই সংশয় থাকবে। সেখানে কথা নাই কিছু। সংশয়ের নিবৃত্তি হয়ে গেল। তারপর আহার্য সংশয়

আছে একটা জিনিষ। আহার্য সংশয় জান তো? আহার্য সংশয় বেদান্তে—দার্শনিক শাস্ত্রে আছে—কল্পিত সংশয় যেটা। সংশয় নাই, কিন্তু একটা সংশয় তৈয়ারী করা হ'ল বুঝাবার জন্য। যদি এরকম এটা হয় মানে এই, মানে এই Euclid-এর Geometry যেমনতর—এটা করে দেখা যায় এটা absurdity যতরকম possibility প্রত্যেকটা দেখা যায় absurd। তাহলে এটা হতে পারে না। মেনে নিয়ে করতে হয়। কিন্তু এটা মানার জিনিষ নয়। কম্পন হবে না সেখানে। কম্পন থাকবে না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য থাকবে। একটু কম্পন করলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যাবে। সেই আকাশের কম্পনের থেকেই সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টিটার নাম ব্যাহৃতি। গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্ন সংশয়াঃ—তখন আর সংশয় থাকে না। এমন জায়গা আছে যেখানে 'silence is more eloquent than speech.'

অহংয়ের স্বরূপ

৯ই আগষ্ট, ১৯৭১ সাল
শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম গুরুজীর ঘর

প্রশ্ন ঃ আমরা দেহাত্মবোধে আবদ্ধ—দেহাত্মবোধ না কাটলে আসল বস্তু লাভ সম্ভব নয়—এই দেহাত্মবোধ কাটানোর উপায় কি?

উত্তর ঃ তুমি 'অহং' পাচ্ছ কোথায়? দেহেতে পাচ্ছ। এই দেহটাকে বাদ দিয়ে তোমার অহংবোধ কোথাও Locate করা যায়? কোথায় সে 'অহং' সে অবস্থা কই? শুধু কতগুলো কথা শুনে কি লাভ? একটা অনুভবকে ধরে ধরে চলো তবে তো বুঝবার সুবিধা হবে। একটা অনুভব যেটা Positive আছে সেখান থেকে ধর। বাকি যেটা আকাঙ্খিত, পরে হবে, তা পরে পাবে। তুমি 'অহং' বলছ, 'অহং' পাচ্ছ কোথায়? দেহটাকে বাদ দিয়ে 'অহং' কোথায় পাচ্ছ? তত্ত্বটা বুঝবার জন্য যখন চেষ্টা তখন 'অহং' পাচ্ছ কোথায়? আর 'অহং' না পেলে 'ইদং' পাচ্ছ কোথায়? (আমি বললাম তা পাচ্ছি না]। তাহলে জিনিষটা বুঝবার চেষ্টা করো। এ সব কথা কেবল Lecture দেবার জন্য নয় বা বই লেখার জন্য নয়! মননের জন্য যখন, তখন ধরো কোথায় 'অহং'? 'ইদংটা' পরে খুলছে। 'অহংটা'ই প্রথম ধরো। বিশুদ্ধ চৈতন্যেতে তুমি 'অহং বোধ' করতে পারছো না। খালি

যে দেহটা সেটাও 'অহং' নয়, কেননা মরে গেলে সে দেহতে 'অহং' থাকে না। তাহলে কোনখানে সে 'অহং' রয়েছে ? প্রত্যেকটা জিনিষ বুঝবার দরকার। আমি 'অহং' কাকে বলছি। এই যে শব্দ—অনেকে প্রায়ই argument করে শব্দের উপর দিয়ে। শব্দের কথা ঠিক আছে। কিন্তু আমি যে বলছি, কিন্তু আমি সেখানে স্থিত হয়ে বলছি কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। কেন না 'অহং' আছে—আছে, body-কে আশ্রয় করে আছে। Body-কে আশ্রয় না করে তুমি 'অহং'-কে পাচ্ছই না। তাহলে 'অহং'-এর কথা না হয়ে 'ইদং'-এর কথা তো পরের কথা। সেই 'অহংটা' কই ? এই হচ্ছে Question। এই যে দেহাত্মবোধ—দেহেতে 'অহং' বোধ—This is the bottom of that... 'অহং' কে, 'ইদং' কে সেটা পরে হবে। আগে 'অহং'টাকে ধরো। 'অহং' কোথায় আছে ? অজ্ঞানবশতঃ দেহেতে 'অহং' বোধ—অজ্ঞান কিসে আছে, কেন আছে—এটা বোঝ। অজ্ঞানেতেই আছে, কেন না প্রত্যেক শিশু বড় হয়—'অহং কথা বলছে তো। একটা কিছু নাই—এটা তো ভূয়ো কথা নয়। এটা কোথায় ? কোন জিনিষটাকে লক্ষ্য করে 'অহং' বলে লোকে ? না হয় ভুলই বলে, কিন্তু একটা কিছু লক্ষ্য করে বলে তো ! কাকে লক্ষ্য করে বলছে 'অহং'টা।

আমি বল্লাম, নিজের আত্মাকে বলব ? বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি আত্মাকে জানি ?' আমি আবার উত্তরে বল্লাম 'জানি না।' তবে ? আত্মা মানেই তো 'অহং'—এটা তো সত্যি কথা, লক্ষ-কোটিবার সত্য, কিন্তু আমি তো চিনি না। আত্মাই তো 'অহং', তাছাড়া তো কিছু নাই কিন্তু আমি আত্মাকে চিনি না তো—এই দেহের সঙ্গে দুটো খিচুড়ী হয়ে আছে। দেহের মধ্যে আত্মার সম্বন্ধ রয়েছে এবং সেই দেহের মধ্যে তুমি অহং বোধ কর।

দেহের থেকে যদি তাকে সরাতে পার তাহলে দেহকে আশ্রয় না করে 'অহং' বোধ থাকবে তোমার—কিন্তু তুমি পাচ্ছ না তো। এইজন্য নাম দেহাত্মবোধ—এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে Lowest standpoint—চার্বাকের সিদ্ধান্ত এটা—তুমি চার্বাককে যতই খণ্ডন কর, তুমি নিজেও চার্বাক—প্রত্যেকেই তাই ! তা হলে সেটা স্বীকার কর। তারপর Theoretically পর পর অবস্থাগুলো......তাহলে চার্বাকের মতই বল আর অন্য কিছু বলো এই যে দেহাত্মবাদ এইটার মধ্যেও দুটো জিনিষ আছে—একটা 'অহং' আছে, একটা 'ইদং' আছে। এই দেহটাকে নিয়ে আমি 'অহং' বলি বটে কিন্তু এই যে আমার বিছানার বালিশটা এটাকে আমি 'অহং' বলি না—এটাও বস্তু, ওটাও

বস্তু। যদি এটাকে 'অহং' বলি, ওটাকে 'অহং' বলি না কেন? মনন করো। আগে 'অহং'টাকে ধরো। শুদ্ধ যে জড় সেখানে অহং নাই, আর শুদ্ধ যে আত্মা সেখানে 'অহং' নাই। শুদ্ধ যে আত্মা যাকে বলি চৈতন্য অবস্থায় আছে, প্রকৃতির সঙ্গে যোগ নাই সেখানে 'অহং' নাই। আর একেবারে inert matter সেখানে অহং নাই। সেটা যে অনুভব করবে অহং-এর Object হিসেবে 'ইদং'—অহং পশ্যামি, অহং...যাই বল 'ইদং' রূপে হয় as an object of consciousness, subject of consciousness হয়—কোথায় হয়? এটাও জড় পিণ্ড এই দেহটা মেদ, মাংস, রক্ত সবই তো জড়—এর মধ্যে কোন জিনিষটা আছে যাকে তুমি অহং বলছ? চৈতন্যটাকে? কিন্তু চৈতন্য as it is তার মধ্যে 'অহং নাই। যখন it is associated with the body সেই সময়েতে অহং ভাবটা আসে—এর নামই দেহাত্মবোধ।

এখন তোমার সঠিক প্রশ্ন কি বল?

আমার প্রশ্ন ঃ কালকে যেটা আলোচনা করছিলাম 'অহং' বলতে সৃষ্টির শুরুতে নিষ্কল অবস্থা থেকে সকল বা কলার আবির্ভাব হ'ল কি করে?

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ নিষ্কল অবস্থা কোনটাকে বলছ?

প্রত্যুত্তরে আমি বল্লাম—যেটাকে আমি সত্তা বলছি, অব্যক্ত যেটা—সেখানটায়।

বাবা বল্লেন—নিষ্কল অবস্থা অনেক উপরে। নিষ্কল অবস্থা যখন হয়ে যাবে তখন শেষ হয়ে গেল—কলাতীতং নিরঞ্জনং—তখন সব কাজ শেষ হয়ে গেল। যাকে তুমি one বলছো, ঈশ্বর বলছো তার লক্ষ গুণ উপরেতে নিষ্কল অবস্ধা। জিনিষটা বুঝতে পার, বুঝাতে পার তবে না?

আমি আবার বল্লাম—আমি যেখানে চিৎ প্রকাশ পাচ্ছি, সেই চিৎ প্রকাশের—background-এ যে সত্তাটা আছে—one

বাবা আবার intervene করে বল্লেন—তুমি ordinary মানুষকে ধর, তার common sense ধর, তার experience ধর, which is common to all, universal all, সেখান থেকে তুমি start কর। কি করে হয়েছে সেটা পরে—এসবগুলো বুঝতে পারলে তখন detail-টা বুঝতে পারবে। আগে নিজের অবস্থা বুঝ এবং বল তা না হলে কেবল শোনা কথা বলবে, এটা তোমার thesis লেখবার জন্য কাজে লাগবে, তোমার নিজের অনুভূতিতে কোন কাজে লাগবেনা। তোমার যেখানে অনুভূতিটা রয়েছে সেখান থেকে start কর। সেখান থেকে start করে পরে তুমি শুধু চৈতন্যটা ধরবার চেষ্টা করো। তাহলে তোমার গতি ঠিক হবে কেননা from the known to the

unknown। সৃষ্টি কি করে হয়েছিল সেটা পরে জানতে পারবে। তখন সেটা বই লেখার জন্য, article লেখার জন্য দরকার হতে পারে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটা তোমার নিজের ভিতরটা খুলে যাওয়া। তাতে যেটা তোমার known feel করেছো সেখান থেকে start কর, তবে সুবিধা হবে। তার থেকে সেগুলো এসে যাবে—সব এসে যাবে। বুঝবার চেষ্টা কর। তা না হলে শব্দ থাকবে, symbol থাকবে কিন্তু কি indicated হচ্ছে বুঝতে পারছ না।

"পূর্ণাৎ পূর্ণং......পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"

বুঝতে পারছো?—যখন subtraction কর তখন একটা থেকে একটা বাদ দাও—১০ থেকে ৪ subtract করলে ৬ থেকে গেল, কি ৮ subtract করলে ২ রয়ে গেল, কি ২ subtract করলে ৮ রয়ে গেল—তাহলে সেই দুটো মিলিয়ে সেই জিনিষটা পূর্ণ বলা হয়—এটা সাধারণ নিয়ম—কিন্তু পূর্ণ যে বস্তুটা সকলেরই প্রয়োজন—যেটা আলোচনা করা উচিত নয়—অনেক দূরের জিনিষ—পূর্ণ বস্তু তার থেকে তুমি যদি কিছু deduct করো তাহলে সে পূর্ণই থাকবে। তার সঙ্গে যদি কিছু add কর তাহলে সে পূর্ণই থাকবে। এই property-গুলো মনে রাখ তবে তো বুঝতে পারবে পরে। অন্য জায়গায় যদি কিছু addition কর তাহলে মাত্রা বেড়ে যাবে।

আর তার থেকে deduction করো যদি কমে যাবে সেটা। আর সেটা addition করলেও বাড়ে না, deduction করলেও কমে না—'পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণম্ এবাবিষ্যতে।' এই কথার এত মূল্য যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড একত্র করলে এর দাম দেওয়া যায় না। এটা না বুঝলে কি করে হবে? এই জিনিষ বোঝ আগে। তাহলে পূর্ণের conceptionটা—এই পূর্ণ থেকে যদি পূর্ণ বাদ দেওয়া হয় তাহলে শূন্য হয় না, পূর্ণই থাকে। Finite নাম্বারের মধ্যে একটা থেকে একটা বাদ দিলে কম নাম্বার থাকে—যা বাদ দিলে ততটা কমে যাবে—৫০ থেকে ৫ বাদ দাও ৪৫ থাকে, ২০ বাদ দাও ৩০ থাকবে কিন্তু পূর্ণতে তুমি তা পাবে না—পূর্ণ থেকে যদি পূর্ণই বাদ দাও তাহলেও সে পূর্ণই থাকবে। তাহলে পূর্ণের conception-টা কি? যাকে বাড়ানোও যায় না, কমানোও যায় না। যা আছে তাই আছে। নির্বিকার আর কি। তাকে বাড়ানোও যায় না আর কমানোও যায় না, একেবারে পূর্ণ।

কতকগুলো জিনিষ বোঝা দরকার—mathematics-এ যেটাকে আমরা 0 (zero) বলি আর যাকে one বলি আর যাকে number বলি। এগুলো না জানলে কিছু বুঝতেই পারবে না। তাহলে পূর্ণ জিনিষের যাকে

আমরা ভূমা বলি সেই পূর্ণ জিনিষ—সেই পূর্ণ থেকে যদি তুমি কিছু নাও—যদি লক্ষ মন দিয়ে নাও তাহলে সে পূর্ণই থেকে গেল এটা তো লৌকিক ধারণায় conception-এ আসবে না। লৌকিক ধারণায় calculation যতটুকু তুমি নিয়ে নেবে to that extent কমে যাবে। কিন্তু পূর্ণের মধ্যে যদি add কর তাহলেও পূর্ণ—বেশী কর, কম কর, যা কর পূর্ণ। তাহলে actually পূর্ণের থেকে deduction-ও করা যায় না। পূর্ণের সঙ্গে addition-ও করা যায় না। তুমি যে 'অহং' বলছ—শিশুর মত মনে কর না কেন? লক্ষকোটি শিশু—একই অবস্থা। কিন্তু একেবারে ছোট শিশু যে তার 'অহং' বোধ হয় না—তার দেহ আছে, কষ্ট বোধ করে, ছটফট করে, সবই করে কিন্তু একটু বয়স না হলে 'অহং' বোধটা হয় না, লক্ষ্য করে দেখো।

এখন ধর এই যে 'অহং' আর এই যে 'ইদং'—'অহং'টা হচ্ছে কি? না তোমার যে সত্তাটা—আমি সত্তা যেটা আছে। প্রত্যেকেরই একটা আত্মসত্তা আছে, মূলে সমস্ত জগৎ একই আত্মা তার থেকে যে অনন্ত ফ্যাকড়া বেরিয়েছে—বলে না 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' তার থেকে যা বেরিয়েছে তাও সেই আত্মাই। এখন সেই আত্মাটা বের করতে হবে। আত্মাটা কি? ধর unknown quality অথবা একটা কিছু যেটাকে লক্ষ্য করে 'আমি' ভাবটা আসে। আমি আমি যে বলে সেইটার আভাস পায় indirectly কিন্তু তত্ত্ব বুঝতে পারে না কিছু—কিন্তু সেইটাকে refer করে আর যা কিছু বোধের মধ্যে আসে সেটা 'ইদং' হয়—সেইটা হচ্ছে লৌকিক ordinary experience—এর মধ্যে তত্ত্ব নাই, philosophy নাই—এখন রয়েছে এটা ভুলে। আত্মাতে 'অহং' বোধটা হচ্ছে স্বাভাবিক। 'অহং' বলা হচ্ছে বটে, অথচ বলা হচ্ছে দেহকে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আত্মা—এর নামই দেহাত্মবোধ। এটাই হচ্ছে নাস্তিকতা—সকলেই নাস্তিক—জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তো নাস্তিক। এটা সকলেরই আছে—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আছে। তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ সাধনার দ্বারা—যেভাবেই সাধনা কর—তখন দেখে যে 'অহং' ভাবটা সত্য। কিন্তু দেহটা 'অহং' নয়। দেহটা 'অহং'-এর সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে, কিন্তু বাস্তবিক সে 'অহং' নয়। 'অহং' জিনিষটা কি? ঐ যে চৈতন্যটা সেই চৈতন্যটাই হচ্ছে 'অহং'। সেটার জন্য সাধনা করতে হয়। সাধনা করতে করতে দেহটা 'ইদং' হয়ে যায়—আলাদা হয়ে যায়, তখন একটা 'অহং' পাওয়া যায়। একদিকে 'অহং' পেলে আর একদিকে 'ইদং' পাওয়া যায়—'অহং'-এর সামনে তার বিষয় রূপে—এই হচ্ছে আসল কথা।

এখন ধর এই যে 'অহং'টা—এই 'অহং' আরম্ভ হয়েছে দেহকে আশ্রয় করে। তারপরে দেহটা যদি নাকি আলাদা হয়ে যায়—দেহের থেকে যদি তোমার separateness-টা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব কর এক মিনিটের জন্য অথবা দেড় মিনিটের জন্য হোক, তাহলে একটা বিশুদ্ধ 'অহং'এর রাস্তাটা খুলে গেল তখন। তা না হলে লক্ষ বছরেও খুলেবে না। এটা ভাল করে বুঝ (না বুঝতে পারলে বড় দুঃখ হয়) নকল 'অহং'টা সকলেই জানে। ব্যবহার করছে সেটা বলবার দরকার নাই। সেটা দেহকে আশ্রয় করে হয়েছে। কিন্তু এই দেহেতে থাকতে থাকতে এমন একটা জিনিষ পাবে তখন বুঝতে পারবে বাস্তবিক 'অহং'-এর রাস্তা সেইটাই। তখন কি হবে তোমার? এখনই বা কি প্রতিবন্ধক তোমার? বল? এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ এইটাই হচ্ছে একনম্বর প্রতিবন্ধক, অথচ এইটাই তোমার জীবনের মূল। এই শ্বাস-প্রশ্বাস না থাকলে তোমার মৃত্যু হয়ে গেল। অথচ শ্বাস-প্রশ্বাসটা থাকবে না। কিন্তু চৈতন্য থাকবে, মৃত্যু নয় সেটা। তখন এ রাজ্যের সবই থাকবে—একটা কণার কণাও নষ্ট হবে না অথচ এই দেহটাকে আশ্রয় করে 'অহং' বোধটা আসবে না—সেইটার নামই হচ্ছে স্রোত—অন্তঃস্রোত অন্তর্মুখীগতি। সেটা তোমার, প্রত্যেকের মধ্যে আছে। সেটা একেবারে যার নাই বা হবে না, তাকে বলে শূদ্র—প্রাচীনকালে তাদের বলতো।

এখন ordinary society-র caste-এর মধ্যে এসে গেছে—এ সংস্কারগুলো ছেড়ে দাও। জন্মনা জায়তে শূদ্র—সেটা রয়েছে—সেটা রয়েছে। যাই হোক সেই একটা জিনিষ রয়েছে তোমার ভিতরে। সেই জিনিষটা যখন নাকি খুলে যাবে তোমার—খুলে যাওয়া শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ খুলে গেলে তুমি তো চরমেতে এসে গেলে—ভূমার মধ্যে গিয়ে পড়ে যাবে। খুলে যাওয়া মানে এক আনা খুলে গেল, দুই আনা খুলে গেল—সামান্য একটু খুলে গেল। খুলে গেলেই তোমার মধ্যে এমন একটা অনুভূতি হবে, যা তোমার লক্ষকোটি জন্মেও হয়নি। এ কথাগুলি মনে রেখো। আমি consciously বলছি। লক্ষকোটি জন্মেও তোমার এ অনুভূতি হয়নি—তুমি উর্দ্ধলোক, দেবলোকে থাক, স্বর্গে যাও, নরকে যাও সেই অনুভূতি তুমি পাওনি—ঐ সময় অর্থাৎ খুলে গেলে যে অনুভূতিটা পাবে। কোনটা? ভিতরের স্রোতটা যদি খুলে যায়—খুলে যায় মানে খুলে যাবে না, খুলে যাওয়ার আভাসটা এসে গেল। আর কিছুই না—এইটা তুমি পাবে। সেইটা তুমি পেলে দেহটা তখন 'ইদং' হয়ে যাবে—বাইরের জিনিষ সেটা। সেই আলোটা আসবে। সেই আলোটা directly আসতে পারে, আবার indirectly আসতে পারে। Indirectly

হচ্ছে কি? Indirectly হচ্ছে প্রথম সে আলোটা আসবে না। প্রথমে আসবে শব্দ। তাকে বলে নাদ। এখন তুমি জানতে পারবে না। সে যখন জানতে পারবে তখন তুমি মহাপুরুষ হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি শুনতে পারবে—এমন শুনতে পারবে যে দিনে রাত্রে—সব সময়েতে। প্রথমে মাঝে মাঝে হবে—এই নাদ আসবে—সেই শব্দ। নাদের function-টা কি? নাদের function হচ্ছে তোমার মধ্যে যে মলিনতা আছে সেই মলিনতাকে শোধন করা—চিত্তশুদ্ধি। যা চেষ্টা করে মানুষ করতে পারে না, কাজেই তোমার মলিনতা আছে, সেই মলিনতাকে সরিয়ে দেওয়া। সেই মলিনতা সরে গেলে তখন কি আসবে? তখন তোমার ভেতরে জ্যোতি, আলো এসে যাবে—বাইরের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, চন্দ্রের আলো নয়, নক্ষত্রের আলো নয়, কোন দেব-দেবীর আলো নয়—কিছু নয়, তোমার নিজের ভিতরকার আলো—সেই আলোটা তখন খুলে যাবে। আলোটা খুলবার পূর্বে নাদটা আসবে। এইটা হচ্ছে natural ক্রম। তারপর ব্যক্তিবিশেষে অনেকরকম তারতম্য হয়ে যেতে পারে। আলোটা আসলে তখন কি হবে তোমার? আলোটা আসলেই তুমি current পেয়ে যাবে—current মানে তোমার ভিতরেতে এমন একটা current আছে যেমনতর উত্তরবাহিনী গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, নৌকাটা ছেড়ে দিলে—স্রোতে তাকে আপনা আপনি নিয়ে যাবে উত্তরের দিকেতে—এইরকম। উত্তরবাহিনী যে স্রোত আছে তোমার মধ্যে মানে প্রত্যেকের মধ্যে—প্রত্যেকের মানে পশুপক্ষীর মধ্যে নাই—পশুপক্ষীর মধ্যে সে স্রোত নাই, নাই, নাই। মানুষের মধ্যে আছে। মনের উদয় না হলে সে স্রোত খুলে না। সেই স্রোত উত্তরবাহিনী স্রোত, তোমার মধ্যে আছে, সেটা প্রথমে চাপা থাকে। যতক্ষণ মানুষ কর্ম্ম করে, কর্ম্মফল ভোগ করে—কর্ম্ম করে, কর্ম্মফল ভোগ করে—জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করে, ততক্ষণ সে উত্তরবাহিনী স্রোত জানে না। উত্তরবাহিনী স্রোত পেয়ে গেলে আর সেটা থাকেই না। যতই কর্ম্মফল ভোগ করুক না কেন, এই স্রোত যদি খুলে যায় তাহলে সে কিছু করুক বা না করুক সেই স্রোতে তাকে নিয়ে যাবে। এইগুলো মনন করবে। এই স্রোতটা আছে। সেই উত্তরবাহিনী স্রোতটা তখন খুলে যাবে। উত্তরবাহিনী স্রোত খুলে গেলে without any effort on your part you will be rising up।

এটার পরিণতি কি হয়? পরিণতি হলো তোমার ভিতরে এমন একটা faculty আছে সব জিনিষ দেখতে পাবে, জানতে পারবে in right time।

[এখন তুমি যে কে তুমি জান না—সে জায়গায় আসোনি এখন পর্যন্ত] সেইটা তুমি জানতে পারবে—সেইটার নামই হচ্ছে জ্ঞানের উদয়—আজ্ঞা চক্রটা খুলে গেল—যে আজ্ঞা চক্রটা খুলবার জন্য ষট্‌চক্র ভেদ করে। ষট্‌চক্র ভেদ করতে গিয়ে সমস্ত life টাই কেটে যায় অথচ ভেদ হয় না। যাই হোক এটা হলো স্থিতি। Point গুলো বলে যাচ্ছি। এ কথা কতবার বলেছি। ঘুরে ফিরে একজায়গাই তা আসবে, দ্বিতীয় আছে কোথায়? তখন সেই জ্ঞানটা এসে যাবে। সেই যে জ্ঞানটা আসলো—সেই জ্ঞান এবং সেই দৃষ্টি যেটার পূর্বেতে জ্যোতির বিকাশ হয়ে গেছে—তখন কি হবে তোমার? তখন তোমার দৃষ্টিটা খুলে গেল—অন্তর্দৃষ্টিটা খুলে গেল। এটা খুলে গেলেই সেই দৃষ্টির দ্বারা একটা অবস্থা পাবে। তারপর ক্রমশঃ সেই পূর্ণের দিকে যাবে—সেটা ছেড়ে দাও। এখন দরকার নাই। তাহলে এখন দেখ, তুমি যে 'অহং' বলছো—'অহং' বলছো এই দেহটাকে। দেহটাকে mean করছো না বটে, কিন্তু দেহটাকে লক্ষ্য করে বলছো। দেহটা যদি কোন function না করে, তখন তোমার সেই 'অহং' বোধ থাকতেই পারে না। দেহটার মধ্যে সেই জিনিস যদি না থাকে তাহলে দেহটা শব হয়ে যাবে—dead body হয়ে যাবে। আর দেহটার মধ্যে সে জিনিসটা যদি থাকে তাহলে অহঙ্কারে তুমি মরলে। দেহটাতে সে জিনিস থাকলো না, অথচ দেহটা শব হয়ে যাবে তাও হবে না। তাহলে কি হবে তোমার মধ্যে? দেহের ভিতরে যে চৈতন্য-শক্তি আছে, সেটা খুলে যাবে। সেই চৈতন্য শক্তিটা তুমি খুলতে পার না। তোমার লক্ষকোটি জন্মের চেষ্টাতেও সেটা তুমি খুলতে পারবে না। nature এসে খুলবে—nature এসে খুলে দেবে। তুমি তাকে help করবে। তুমি retard করবে না, তুমি দেখবে যাতে সে বাধা না পায়। তাহলে তোমার সেটা খুলে গেল। খুলে গেলেই তখন তুমি দেখবে এই দেহটা আমি নই। দেহটা একটা পিণ্ড, এটা আশ্রয় করে তুমি রয়েছ। কিন্তু এটা তুমি নও।

এটা তুমি যখন বুঝতে পারলে তখন অনেকটা advancement এসে গেল, তখন দেখবে তুমি সেই যে জিনিসটা—এ দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে, সেই জিনিসটা হচ্ছে বাস্তবিক 'অহং'। আর সেই জিনিসটা যেটা সে নিজের সামনে দেখতে পাচ্ছে, সেটা হচ্ছে 'ইদং'। বুঝতে পারছ? তারপর এমন একটা সময় আছে যখন নাকি 'ইদং' থেকে 'অহং'টা cut off হয়ে যায়। আবার একটা সময় আছে যখন 'অহং' থেকে 'ইদং'টা cut off হয়ে যায়—এই দুটো অবস্থা আছে। এই দুটো বোঝা কঠিন। এটা বুঝবার জিনিস।

'ইদং' থেকে যখন 'অহং'টা cut off হয়ে যায় তখন 'পূর্ণ অহং'-এ এসে যায়। কাজেই এই দেহটাকে আশ্রয় করে যে 'অহং' বোধ হচ্ছিল, সেই 'অহং' আর তখন থাকে না। তখন জীব ভাবটা পূর্ণের মধ্যে প্রবেশ করে। আবার একটা অবস্থা আছে, ঐ যে পূর্ণের 'অহং' বোধটা সেইটা থেকে cut off হয়ে এদিকে তুমি চলে যাবে—এই দুটো অবস্থা।

যাই হোক একটা অবস্থা আছে, যখন 'অহংটা' পূর্ণের দিকে যায়—তখন 'অহংটা' হয় পূর্ণ। অনেক কারণ আছে সেই অবস্থার মধ্যে। পরমার্থ পথে কোন এক জায়গায় একজন বসে নাই। তোমার মধ্যেই সব রয়েছে তো। জীবাত্মাও তোমার মধ্যে, পরমাত্মাও তোমার মধ্যে, জাগ্রত অবস্থাও তোমার মধ্যে, সুষুপ্তিও তোমার মধ্যে, তুরীয়ও তোমার মধ্যে, তুরীয়াতীতও তোমার মধ্যে, আবার তুরীয়তাতীতের অতীত যে অবস্থাটা সেটাও তোমার মধ্যে।

যখন যখন যেটা কাজেই......ভাল করে বুঝা দরকার। তাহলে তোমার মনে আশ্বাসন আসবে কোথায় আছি। আমি যাব কলকাতায়। আর আমি যদি মাঝখানে বিপাকে পড়ে থাকি, বুঝতেই পারলাম না কলকাতা কতদূরে, আর কোথা থেকে আসলাম। সেইরকম আর কি!

পূর্ণেতে গিয়ে 'অহং' থাকে না। 'পূর্ণ অহং'ও থাকে না। এ কথাটা মনে করে রেখে দিও। 'ইদং'ও থাকে না। থাকে একটা জিনিস। সেই জিনিসটা হচ্ছে কি? সেটা নিস্পন্দ না স্পন্দযুক্ত? সেটা নিস্পন্দও নয়, স্পন্দনযুক্তও নয়—তারও অতীত অবস্থা—সেইটাই হলে Truth। তাহলে truth বললে বুঝবে তুমি বিরাট চৈতন্য, সেটাও truth নয়। সেটা অনেক উপরের অবস্থা। আনন্দও truth নয়। চিৎও নয়—আনন্দও নয়—কেন না এই দুটোর উপরে আছে সৎ তারপর চিৎ, তারপর আনন্দ। 'আনন্দ' বলতে গেলেই তুমি তার ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপরে অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এসে গেলে। তারপরে যেখানে প্রকাশও প্রকাশমান নয়, সেটা বলা যায় না—সেটা প্রকাশেরও অতীত। অথচ সেই অব্যক্ত যে স্থিতি সেইটাই প্রকাশমান হচ্ছে। সেটাই হচ্ছে সত্য। সেটাকে God বল, Absolute বল যা কিছু বলতে পারো। অনেক দূরে। তার পূর্বে তোমার কি চাই? সে জিনিসটা তো পাচ্ছ না এখন। সেই জিনিসটাই ক্রমশঃ নেমে এসে জগৎ তৈরী হয়েছে ও তারপর কাল হয়েছে—মহাকাল হয়েছে, বিশ্ব হয়েছে, অনন্ত বৈচিত্র্য হয়েছে, ষটত্রিংশ তত্ত্ব হয়েছে, তত্ত্বের background-এ অনন্ত কলা হয়েছে, তারপরে নিষ্কলও হয়েছে। নিষ্কল হওয়ার পূর্বেতে দুরকম অবস্থা আছে—একটা অবস্থা আছে শান্তকলা, আর একটা অবস্থা আছে

শান্ত্যতীত কলা। কাজেই নিষ্কলে যাবার পূর্বে একটা শান্ত অবস্থা আছে—কোন একটা স্পন্দন ওঠে না। কোন একটা vibration নাই—সেখানেও perfection নাই। তারপরেতে একটা অবস্থা আছে শান্ত্যতীত—শান্তিকেও transcend করে গেছে, শান্ত অবস্থাকে, সেটাও সকল—তাতেও কলা কাছে—তার নাম হচ্ছে শান্ত্যতীত কলা। তাহলে এই যে তুমি যেখানে গেলে, তুমি শান্তও নও, কিন্তু অশান্তও নয়, বুঝ। একেবারে relation-এর উপরে—সেটা হচ্ছে নিষ্কল। সেখানে গেলে দেখবে সবই তুমি। এখন তুমি নেতি নেতি করে যাচ্ছো। সেখানে গিয়ে তুমি অনুভব করবে সবই তুমি—শান্তিও তুমি, শান্ত্যতীতও তুমি। তোমার parallel যে সেও তুমি, ভাল যে সেও তুমি, মন্দ যে সেও তুমি, অণু তুমি, মহান্‌ও তুমি—সব তুমি। তুমি ছাড়া কিছুই নাই। অনন্ত জগতের অনন্ত জীব আছে, সব সত্য, কিন্তু সবই তুমি। তুমিই অনন্ত হয়ে আছ। তোমাকে বলছি বলে তুমি বলছি। যাকে বলব তাকেই এই কথা। সবই তুমি। তুমি ছাড়া কিছুই নাই। তখন সব সমন্বয় হয়ে যাবে। এই হল তত্ত্ব। এইগুলো ভাল করে বুঝবার চেষ্টা কর। মনন না করতে পারলে কিছু হবে না। কতগুলো শব্দ শুনে রেখে ওর ভিতরেতে নিজেকে আটকে থাকা।

বাস্তবিক যে স্থিতি স্থান, সেটা কোথায় ? সেটা ঠিক একও নয়, নানাও নয়—এক ও নানার background-এ সেটা আছে। সেটাকে কোন ভাষা দিয়ে বুঝানো যায় না। একেরও অতীত, নানারও অতীত—নানার অতীত তো বটেই। সেটা সব সময়েতে আছে। সেটাই হল সত্য তারপরে তুমি অদ্বৈত কর, দ্বৈত কর—সেগুলো হচ্ছে তোমার মন বা বুদ্ধির purity অনুসারে বিভিন্ন স্তরের খেলা। সবগুলিই সত্য। কোন ভুল নাই। আবার সবগুলিই কিছু নয় কেন না তাকেও transcend করে সেখানে যেতে হবে। এই হচ্ছে আসল কথা।

পাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিসটা কখন পাবে ? সেখানে গিয়ে দেখলে যে এর পরেতে আর বর্ণনা করা যাবে না—সেখানে সে কোন জিনিসটা ? সবচেয়ে highest কোনটা ? পূর্ণাহং। যেখানে বলছি সেখানে ‘অহং’ও নাই, ‘পূর্ণাহং’ও নাই। নাই যে তাও নাই। কোনরকম কল্পনা সেখানে চলে না। কিছু চলে না—সবকে ধরে রয়েছে সে। কাজেই নানা যেটা তাকেও তো সেই ধরে রয়েছে। অদ্বৈত যেটা তাকেও সেই ধরে রয়েছে। সে জিনিসটা অদ্বৈতও বলা যায় না। দ্বৈত বলা যায় না। সেই অতীত

অবস্থা স্থিতি। সেই অবস্থাটা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সে অবস্থা describe করা যায় না। Describe করতে গেলেই কোনো না কোনো একটা স্তরে পড়ে যাবে তুমি। সে জিনিসটা এই রকমের, তার সঙ্গে কিছু add করার উপায় নাই। Add করলেও বাড়ে না, তার থেকে যত কিছু নাও, পূর্ণ থেকে পূর্ণই টেনে নিয়ে যাও, তাহলেও সে পূর্ণই থাকে। বাড়েও না, কমেও না। কিন্তু জাগতিক বিষয়ে add করলে বেড়ে যাবে, আবার তার থেকে সরিয়ে দিলে কমে যাবে সেটা। কিন্তু এখানে add করলেও সমানই থাকে। সরিয়ে নিলেও—তার থেকে সমস্তটা যদি সরিয়ে নাও তাহলেও সে ঠিকই থাকে—সমস্তটা সরিয়ে নিলেও সমস্তই রয়ে গেল। 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'। পূর্ণ থেকে পূর্ণও যদি নিয়ে যাও তবু থাকলো পূর্ণ। সরাতে পারলে না তাহলে। আর যদি add কর তাহলেও বাড়ল না। সে অবস্থায় কি দেবে তাঁকে, সবই তো তাতে আছে। যত কিছু দাও বাড়ে না, যত কিছু পার কমিয়ে নাও তাও সে কমে না। এই তো আমাদের উপনিষদিক philosophy-তে পরিষ্কার বলেছেন সেটা। সেই হল তার ভূমা। Infinite বলতে চাও বলতে পার, Finite-ও তো সেই। সত্য বলতে চাও তাও। মায়া বলতে চাও বল। কিন্তু সত্যের পিছনেও সেই রয়েছে। মায়ার পিছনেও সেই রয়েছে। একটা idea করে নিতে হবে—তা না হলে সীমার মধ্যে এসে পড়বে। একটা জায়গায় আছে absolute unity—তা তো সত্য। আবার infinite variety of infinite কাল তাও রয়েছে। তা না হলে আসলো কোথা থেকে? তাহলে হল এই দুটো যে পরস্পর বিরুদ্ধ এই দুইয়ের যেখানে সমন্বয় সেইটাই হল আসল। সেইটাই ভূমা। আর বাকী সব অল্প। 'ভূমৈব সুখং'—ভূমাটাই হচ্ছে প্রকৃত সুখ। অল্পের মধ্যে সুখ নাই। অল্পকে যদি তুমি অসীম বল, তাহলেও সে অল্প—সান্তকে বাদ দিলে তাহলে। Limited-কে বাদ দিলে তাহলে। কাউকেই যে বাদ দেবার নয়। আর একের মধ্যে যত ইচ্ছা আন সে বলবে আমার মধ্যে জায়গা আছে সব জিনিসের। শান্তিকলাও নয়—শান্ত্যতীত কলাও নয়—এইটাই হল নিষ্কল। Absolute বলে শব্দ বল্লে তো পেট ভরবে না। conception-টা তো চাই। Absolute বল্লে হবে না, নিষ্কল ব্রহ্ম বললে হবে না, পরাৎপর ব্রহ্ম বললে হবে না—শব্দ দিয়ে কি হবে তোমার?

আমার পরিপ্রশ্ন ঃ যদি তাঁকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলি সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ তাহলেও তাঁকে Limit করা হল নাকি?

উত্তর ঃ সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্—সত্য কথাই তো সেটা—সেইটাই

সত্য—সেই হল প্রকৃত জ্ঞান। কেবল শব্দটা বললে তো হবে না, conception--গুলো মনের মধ্যে আসা চাই তো। তোমার conception তো বুদ্ধি দিয়ে হবে—বুদ্ধির যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকু তো সে করবে। কাজেই এখন ধরবার জিনিস হচ্ছে ক্রমশঃ ক্রমশঃ স্তরগুলো, যাতে সব জিনিসের সমন্বয় হয়। বিরোধের সমন্বয় করবে কি করে তুমি যদি একটা জায়গাতে fixed হয়ে থাক—সে জায়গাতে আসে নাই যে, সে তো সবই তোমার বিরুদ্ধে —এ জগতের সবই তাই। দ্বৈতও সত্য, অদ্বৈতও সত্য। শেষকালে দ্বৈতও থাকে না, অদ্বৈতও থাকে না—দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্। কাকে তুমি বাদ দেবে? যত রকম system of thought হয়েছে, কোন না কোন level of consciousness থেকে তো হয়েছে—it has its existence। কিন্তু চরম সত্য তাকে বলতে পার না। চরম সত্য কোনটাই নয়। Herbert Spencer--এর Synthetic Philosophy—সবগুলিরও স্থান দিতে পার তুমি। এইটাই হচ্ছে liberal—পূর্ণ Liberal। কিন্তু না বুঝতে পারলে বলবে যে পাগলের প্রলাপ—contradiction-এ ভরা। contradiction তো এক হয় না, contrary--টা এক হতে পারে—কিন্তু হয়। ভূমাতে হয়—সেখানে contradiction নাই। যাই হোক জিনিসটা বুঝবার চেষ্টা কর।

Integration-য়ের স্বরূপ

প্রশ্ন—Integration কথাটা শুনে থাকি অথচ তার যথার্থ তাৎপর্য বুঝি না—একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর—Integration-এর চরম কোথায় আর differentiation-এর চরম কোথায়? Integration মানে কি? Integration মানে হচ্ছে যেখানে বহু দেখা যায় তার ভিতরে একটা unity রয়েছে। সেটা যদি ক্রমশঃ প্রবল হতে থাকে তাহলে তার চরমে কি অবস্থা হয়? Creation-এর চরমটা unity নয়? Integration processটাই হচ্ছে ক্রমশঃ একের দিকে অগ্রসর হওয়া—এক মানে কোন একটা জায়গা রয়েছে আমি দৌড়িয়ে যাচ্ছি তা নয়, তোমার মধ্যেই সেটা। তাহলে unification মানে এখন যে বৈচিত্র্য দেখি, বহু দেখি, নানা দেখি, অনন্ত ভেদ দেখি এগুলো ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখা যায় একের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—একের মধ্যে চলে যাচ্ছে। কি Pure এক?

Union যেখানে বলি সেটা কি অবস্থা ? Integration সেখানে শেষ হয়ে গেছে—integration নাই। সেইটেই হচ্ছে integral সত্তা। integral মানে অখণ্ড—একেবারে এক। আর differentiation-এর যে process চলছে সেটার end কোথায় ? যেমন বহুর মধ্যে integration হয় তেমনি একের মধ্যে differentiation তো হয়—just the opposite– সেটার end কোথায় ? ক্রমশঃ বহুত্ব বেড়ে যাচ্ছে—কোন্ point-এ গেলে আমি বলতে পারব এখানে differentiation শেষ হয়ে গেল ? Integration যেখানে শেষ হয়ে গেল সেটা হচ্ছে one—one মানে ধর X^1—differentiation শেষ হচ্ছে কোথায় ? আরে বিশ্ব। Integration মানে হচ্ছে যেখানে এক একই রয়েছে—সেখানে স্পন্দনের স্প-ও নাই—পূর্ণ এক—একই রয়েছে—one। আর differentiation-এর শেষ কি ? Many—many মানে কি ? বিশ্ব—সব—সব মানে একটা জগৎ নয় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জগৎ—তার যে totality টা তাকে বলা হয় many—কোনটা বাদ যায় না। এর পরে হল দুটোই এক। যা বলছি তোমাদের শোনা কথার মধ্যেই কিন্তু সেটা বুঝবার তারতম্য আছে তো।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্—সবই রয়েছে এর মধ্যে। অখণ্ড মণ্ডল বলে কোন্‌টাকে ? অখণ্ড শব্দটা রয়েছে, সেখানে many আর one এক হয়ে গেছে। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্—চর আছে, অচর আছে, স্থাবর আছে, জঙ্গম আছে—লক্ষ লক্ষ হোক না কেন taken them together—সেখানে সবই আছে। তুমি ১০ হাজার বৎসর পূর্বে যে জন্ম নিয়েছিলে তখন যে চেহারাটা ছিল তাও পাবে—সবই পাবে। আর one এর মধ্যে কিছু নাই—একই এক, কি এক বলা যায় না। কোন রূপ নাই, আকার নাই, কিছু নাই সেখানে। আর বহুর মধ্যে সমস্ত বৈচিত্র্য রয়েছে। তারপরে দেখবে একটাই জিনিস রয়েছে। এইটা যে বুঝতে পারে তার নাম হচ্ছে গুরু। মুখ দিয়ে বুঝানো নয়। মনন করে সেইখানটায় যেতে হবে। [ঠিক মননের রাস্তা ধরে অভ্যাস কর। সময় চলে যাচ্ছে]। এমন একটা সময় আসছে যখন অখণ্ড মহাযোগের অবস্থাটা খুলে যাবে। সেটাতে consciously যাতে part নিতে পার সেজন্য মননটা দরকার। চেষ্টা করে কি মানুষ সেখানে যেতে পারে ? যে যেখানে আছে সে সেখান থেকেই নিজের কাজটা করে যাবে। One আর many-র সমন্বয় সেখানে হয়ে যাবে। আর তা না হলে তুমি ২ মাস ৪ মাস ডুবে পড়ে থাকো সমাধিতে তাতে কিছু হবে না। অর্থাৎ পূর্ণ জিনিসটা পাবে না। সেখানে দেশ-কালও নাই

আবার দেশ-কাল আছে। দেশ-কালের conception-ও নাই আবার সব আছে।

পরিপ্রশ্ন—এই যে এক এটা কি পূর্ণ অহং-এর পরের অবস্থা ?

উত্তর—এই এক যে সেই একটাই হচ্ছে পূর্ণাহং। আর এই নানা—এই নানা হচ্ছে বিশ্ব। দুটো জিনিস একই। নানাও সে একই। একই সে নানা। কাজেই একটা যখন নানা হয়ে ফোটে তখন জগৎ সৃষ্টি হয়। ফোটায় কে ? কেউ ফোটায় না—ফোটায় সেই স্বাতন্ত্র্য। সেই স্বাতন্ত্র্য থেকে এক থেকে নানা হয় আবার নানা থেকে এক হয়। জগতের ভাষাতে সেখানে কর্ম আসে। সমস্ত কর্ম শেষ পর্যন্ত যায় না। কেন শেষ পর্যন্ত যায় না কর্ম ? কর্তৃত্ব অভিমান চলে গেলে কর্মের existence চলে গেল—কোথায় কর্ম তখন ? কর্তৃত্ব অভিমান চলে গেলে কি আসে ? Surrender আসে, সেই surrender-টা যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখনই একটা আনন্দ পাওয়া যায়। সেই আনন্দেতে যদি বিশ্রাম নেওয়া যায় তাহলে সেখানে স্থিতি হয়। আর সেখানে বিশ্রাম না নিয়ে যদি supramental স্থিতিতে যেতে পারে divine evolution শুরু হয়ে যাবে তখন। তারপর পূর্ণ সত্তাতে...... ছোট আছে, বড় আছে, ভাল আছে, মন্দ আছে তোমার individuality তখন great universal-এর মধ্যে যায় না। থাকবে না তা নয় তবে universal-এর সঙ্গে এক হয়ে থাকবে। কিছুই থাকবে না অথচ সব জিনিষ থাকবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে থাকবে—হ্যাঁ আর না দুটোর সমন্বয় হয়ে যাবে।

পরিপ্রশ্ন—বুদ্ধির স্তর থেকে এক আর নানার সমন্বয় করতে গেলে দ্বন্দ্ব থাকে।

উত্তর—বুদ্ধির স্তর থেকে সমন্বয়টা বুঝতে হবে। স্থিতি হলে বুদ্ধির স্তর থেকে সমন্বয়টা তোমার সামনে ভাসবে। সেইটেই ভাসছে না এটাই হচ্ছে কথা।

সূত্রে মণিগণা ইব—গীতার মধ্যে আছে না ? মালার মধ্যে ফুলগুলোও আছে আবার সুতোটাও আছে—ফুলগুলো আছে আলাদা আলাদা আর সেগুলোকে এক করছে কে ? সুতো। দুটো নিয়ে হচ্ছে মালা, এইটা বুঝবার চেষ্টা করো। একও বাদ যাচ্ছে না অথচ দুটো inter-connected —এই দুটো নিয়ে একটা জিনিস অর্থাৎ খণ্ড ভাবটা থাকবে না। মালার প্রত্যেকটি ফুলই একটা সুতোর সঙ্গে connected। একটা সুতোকে খুঁজে বের করতে হবে—আর একটা সুতোকে যখন খুঁজে পাবে তখন সেই সুতোর দিক থেকে যদি তুমি দৃষ্টিপাত করো তাহলে দেখবে অনন্ত বৈচিত্র্য রয়েছে—

লক্ষ লক্ষ জন্ম, লক্ষ লক্ষ জীব, তার সংস্কার সবই—প্রত্যেক দিনের, প্রত্যেক moment-এর। প্রত্যেক second-এর detail তুমি ইচ্ছা করলে বের করতে পারবে, কেন না তার বাইরে তো কিছু নাই—সবই তো তার মধ্যে। কিন্তু এককে না পেলে commanding view-টা পাবে কি করে? এককে না ধরলে বহুকে আয়ত্ত করবে কি দিয়ে? আর বহুকে যদি না রাখতে পার তাহলে তুমি এককে নিয়ে শূন্যে পড়ে যাবে—শূন্যে স্থিতি হয়ে যাবে। বহুকেও রাখতে হবে—এককেও রাখতে হবে—অথচ দুটোই separate রাখলে হবে না—দুইয়ের সামঞ্জস্য হওয়া চাই। এখানে শৈব আর বৈষ্ণবের question নাই। হিন্দু আর মুসলমানের question নাই, বৌদ্ধ আর জৈনের প্রশ্ন নাই, বালক আর বৃদ্ধের difference-এর question নাই, শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের question নাই—সকলের জন্যেই সে—He stands for all। পরমাত্মা বলো, ভগবান বলো, নিত্য লীলা বলো সবই ওর মধ্যে ধরা পড়ে যাবে—কোনটার পর কোনটা। তা না হলে শব্দটা মুখস্থ করে রেখে দিলে হবে না তো কিছু।

পরিপ্রশ্ন—এই যে শূন্যে স্থিতির কথা বল্লেন, এটা আমি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছি না।

উত্তর—শূন্য বলে একটা জিনিস বৌদ্ধরা বলেছে তো। শূন্যটা কি? তারা শূন্য বলে যে জিনিসটা লক্ষ্য করছে, সে জিনিসটা কি?

আমার উত্তর—কিছুই থাক্‌ছে না।

প্রত্যুত্তর—কিছু থাকছে না তুমি বলছ। কিছু থাকছে না এই বোধটা যদি থাকে তাহলে রয়ে গেল কিছু—কিছু থাকছে না এটা স্থিত হবে কিসে? শূন্যের দ্রষ্টারূপে না? দ্রষ্টা যদি না থাকে তাহলে শূন্যের কথা বলে কে? তাহলে কিছু থাকছে তো। নিজের কাছেই তো নিজে ধরা পড়লে। শূন্য বলো, মহাশূন্য বলো, যত কিছু বলো তার পিছনে যে দ্রষ্টা রয়ে গেছে, দ্রষ্টা যে তার সাক্ষিস্বরূপ, সাক্ষী তো রয়ে গেছে। আর সাক্ষীকে তুমি যদি বাদ দাও তাহলে তার সম্বন্ধে বলবার কি আছে—তোমার চিত্তের বৃত্তিজ্ঞান তো সেখানে যাবে না? মন নাই সেখানে অথচ একটা বোধের বিষয় রয়েছে। আর সেই সাক্ষিরূপে জিনিষ বোধে যদি না থাকে তাহলে কি থাকে—এইটা বুঝে নাও। খালি কতগুলি কথার ভেল্কিতে ভুলে যেয়ো না।

আমি বল্লাম—সূত্রে মণিগণা ইব বুঝতে হবে তাহলে।

বাবা প্রত্যুত্তরে বল্লেন—সূত্রও দেখতে হবে, মণিগণও দেখতে হবে, আবার দুয়ের সমন্বয়ও দেখতে হবে—কেন না সূত্রে তো গাঁথা মণিগণা—মণিগণা

আলাদা আলাদা নয় তো। একটা ফুলের মালা, ফুলগুলো আলাদা আলাদা রয়েছে, একটা সুতো দিয়ে গাঁথা রয়েছে—তাহলে একটা unity-র মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য গাঁথা রয়েছে। আবার এমন অবস্থাও তো আছে, ফুলগুলো নাই কেবল সুতো আছে, তাহলে সেটা মালা হলো না। ফুল যদি না থাকে সুতোটা তুমি দেখবে কি করে? সুতোটা ফুলের ভেতর enter করে যাচ্ছে, সেই ভাবে সুতোটা থাকছে—মালাতে গেঁথে দিয়েছে। যেখানে ফুলগুলোই নেই সেখানে সুতো কোথায়? এই ভাবে শূন্য, মহাশূন্য বোঝবার চেষ্টা করতে হয়। দ্রষ্টা থেকে যায়, সাক্ষিচৈতন্য যাকে বলে।

আমার পরিপ্রশ্ন—এমন অবস্থাও কি হয় যেমন আমরা বলে থাকি বিনি সুতোয় মালা গাঁথা?

বাবার উত্তর—হ্যাঁ, সে অবস্থাও আছে। সেই জন্যই তো কথাটা এসেছে। মালা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সুতো পাচ্ছে না। Unifying thread-টা খুঁজে পাচ্ছে না, অথচ মালা আছে। বৈচিত্র্যটা অনুভব করবে। সেই বৈচিত্র্যটা কোন্ unity-র under-এ unified হয়েছে সেটা পাবে না। সুতোকে বাদ দিলে ফুল পেয়ে যাবে কিন্তু মালা তো পাবে না। যারা নাস্তিক তাদের highest speculation-ও এখানে fail করে, কেননা unifying thread-টা পাচ্ছে না—details-গুলো তাদের ভাবে আসছে। আবার স্বগতভাবে বললেন, প্রকাশ আছে—সব উদয় হচ্ছে কোথা থেকে—একটা প্রকাশের সঙ্গেই তো—সেইটে ধরবার চেষ্টা করলে—সবগুলো পর পর এসে যায়।

এই প্রসঙ্গে বাবা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কাল কি সক্রিয় না নিষ্ক্রিয়?

আমি উত্তরে বললাম—কাল তো সক্রিয় বলেই আমার মনে হয়।

বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কালের function কি?

আমার উত্তর—পরিণাম।

বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—পরিণাম মানে কি? পরিণামের অর্থ কি? ক টা খ হয়ে যাচ্ছে, খ টা গ হয়ে যাচ্ছে—এই process-টাকে পরিণতি বলবে? ধর একটা বীজ আছে অথবা একটা ফুলের অঙ্কুর আছে, তার থেকে সম্পূর্ণ ফুলটা ফুটছে, বীজের থেকে বৃক্ষটা ফুটছে। তার যে পর পর অবস্থাগুলো আছে—সেই অবস্থাগুলো একটা অবস্থার থেকে আর একটা অবস্থা আসছে; সেটার পরে আর একটা অবস্থা আসছে—এই যে জিনিস-গুলো এটাকে পরিণতি বলা যায় কিনা? বীজের থেকে অঙ্কুর হচ্ছে, অঙ্কুর

থেকে বৃক্ষ হচ্ছে, ক্রমশঃ পরিণত হচ্ছে তো, কি আলগা আলগা একটা জিনিস হয়ে যাচ্ছে—তা তো নয়। Connected thread একটা আছে তার মধ্যে। একটা গাছ আর একটা গাছের সঙ্গে combined হয়ে রয়েছে—সৃষ্টি হবে কি করে ?

একটা ধারা রয়েছে—সেই ধারার মধ্যে unifying principle হচ্ছে সুতোটা যে কথা আগে বলা হলো, সূত্রে মণিগণা ইব। কিন্তু তারপরে আলাদা করে তুমি মালা গাঁথছো। একটা মালা আছে—মালার মধ্যে ধর ফুলগুলো a, b, c, d সব মালাটা নিয়ে alphabet কেননা a আছে তারপর b আছে, তারপর c আছে, তারপর d আছে কিন্তু মালা তো একটা—একটা হলো কিসের জন্য ? a, b, c, এগুলো unify করছে ফুলের মালার ভিতর দিয়ে যে সুতোটা রয়েছে। একটা মালা—a-এর পরে b আসল, b-র পর c আসল—কথাটা চিন্তাই করো না তোমরা। জাগতিক দৃষ্টান্ত দিলে আলাদা আলাদা ফুল আছে। একটার পর একটা ফুল নিলাম সূঁচ সুতো দিয়ে গাঁথতে লাগলাম কিন্তু আসলে a বলে একটা জিনিস আছে, b বলে একটা জিনিস আছে, ট বলে একটা জিনিস আছে—এ তো পরিণতি হলো না—পরিণতি কি করে হলো ?পরিণতি হলে a becomes itself converted into b, b becomes converted into c, তবে তো পরিণতি হবে। বালকের দেহটাই যৌবনে পরিণত হয়, সেই দেহটাই বৃদ্ধতে পরিণত হয়। অথচ a b-তে যদি পরিণত না হয় তাহলে তুমি isolated units-কে গাঁথলে—তাতে পরিণাম আসেই না মোটে। A becoming converted into b, b becoming converted into c—এ নয় যে a একটা আলাদা, b একটা আলাদা, c একটা আলাদা—এটাকে মিলিয়ে দিলাম, তা না। আলাদা আলাদা জিনিসগুলো খিচুড়ি করলে হয় না। একটা জিনিসই পরিপক্ক হয়ে আর একটা জিনিসে পরিণত হলো। এই দুটো জিনিস এক জিনিস নয়—বুঝতে পারছো ? A becomes converted into b—এটা কে করে ? কাল করছে। তুমি যদি কালকে বাদ দাও সে ক্ষমতা যখন তোমার আছে তখন পরিণাম থাকবে কি ? পরিণাম তখন থাকবে না। অথচ সে সময়েতে এই মালার মধ্যে stage যতগুলো আছে যে কোন stage তুমি পেতে পার—সেটা কি করে হয় ? রবি ঠাকুরের intuition এসেছিল উর্বশী কবিতায় তা প্রকাশ পেয়েছে—বালিকা ছিল না অথচ প্রথম থেকেই যৌবন ফুটে উঠল। তাহলে যে কোন সময়েতে যে কোন stage-টা eternal পাওয়া যায়। নিত্য কুমারী, নিত্য যুবতী, নিত্য বৃদ্ধা—সমস্ত নিত্য। সেখানে পরিণাম কি ? শ্রীকৃষ্ণ

যেখানে নাকি নিত্য লীলা করছেন—নিত্য ষোড়শ বর্ষ সেখানেতে...... অস্তিত্বই নাই—যাঁকে পাচ্ছ তাঁর কোন ১০ বৎসর ৫ বৎসর নাই—কিছু নাই। নিত্যং ষোড়শবর্ষীয়ো ভগবান্ অন্তকান্তকঃ—কিশোর, নিত্য কিশোর। সেখানে পরিণাম নাই। শিশু ছিল, বালক হবে তারপর development হতে হতে যুবক হবে সেটা তো আলাদা জিনিস। সেটা তো কাল করছে—পরিণামটা কালের। আর যেখানে নিত্য ষোড়শবর্ষ—হাজার বৎসর পরেও ষোড়শবর্ষ—১০ হাজার বৎসর পরে যদি কারও দর্শনের ভাগ্য হয় সেও দেখবে ষোড়শবর্ষ। সেখানে কাল কোথায়? সেইটেই যদি তুমি চিরস্থায়ী-রূপে পেয়ে যাও তাহলে নিত্য হয়ে গেল—কাল নাই সেখানে।

ভারী চমৎকার জিনিস। নিত্য যুবক সে চিরকালই যুবক আছে, কোন কালে শিশু ছিলই না। অথচ জিনিসটা একই, সে-ই নিত্য কিশোর, সে-ই নিত্য যুবক, সে-ই নিত্য বৃদ্ধ। A bundle of contradiction অথচ absolutely true—এটাকে সমন্বয় করতে না পারলে infinite-কে বুঝবার চেষ্টা বৃথা—অরবিন্দ বলেছিলেন অনেককাল আগে। এই যে দহর বিদ্যার উপাসনা—এর মানেও তো তাই। হৃদয়ের ভিতর অনন্তকোটি বিশ্ব ভাসছে অথচ......দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম।

তন্ত্রের মূল তত্ত্ব

প্রশ্ন ঃ তন্ত্রের মূল তত্ত্বটা কি বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ঃ মূল হল চিৎশক্তিকে স্বীকার করা, recognise করা এবং বিশ্বের সমস্তের মূলে চিৎশক্তি বিদ্যমান। চিৎশক্তি আর কোনখানে নাই—চিৎশক্তি বেদান্তের মধ্যে নাই—ষড়্দর্শনের কোনখানে নাই। চিৎশক্তি স্বীকার বা recognise করলে যা কিছু স্থিতি আসে সবটাই হল তন্ত্র—অনেক কথা আছে। এইজন্য বেদান্তের মতকে শান্ত ব্রহ্মবাদ বলে—চিৎশক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মবাদ নয়। চিৎশক্তি সম্পন্ন ব্রহ্ম, তাঁকেই তো শিব বলে। চিৎ-শক্তি যুক্ত হলেই তাঁর নাম হয় পরম শিব। এই চিৎশক্তির সঙ্গে শিবের যে সম্বন্ধ তার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য একটা হচ্ছে শিব-শক্তি সমান সমান—আবার শিবশক্তির মধ্যে শিবের প্রাধান্য, শক্তি তাঁর আশ্রিত—আবার শক্তির প্রাধান্য, শিব তাঁর আশ্রিত। এর থেকে অনেক রকম স্থিতি হয়।

সৃষ্টিটা হয় কিসের থেকে? শিব-শক্তি যখন সমান সমান থাকে তখন

সৃষ্টি হয় না। তার নাম হচ্ছে শিবশক্তির সামরস্য। শিব ও শক্তি যদি সমান থাকে তাহলে সেখানেতে সৃষ্টি হয় না। কেন সৃষ্টি হয় না? শিব শক্তি সমান হয়ে গেলে কলার উৎপত্তি হয় না। আর কলা না হলে বিশ্বজগৎ তৈয়ার হবে কি দিয়ে? অণু-পরমাণু বল, মন বল, যা বল তার মূল তো কলা। শিবশক্তির সামরস্য হচ্ছে নিষ্কল অবস্থা। নিষ্কল অবস্থায় কলা থাকে না, সৃষ্টি হতে পারে না।

তারপর শিবের প্রাধান্য হতে পারে, শক্তির অপ্রাধান্য হতে পারে—শক্তির প্রাধান্য হতে পারে, শিবের অপ্রাধান্য হতে পারে।

সৃষ্টি যে হয় উপাদান কে তার? সৃষ্টির উপাদান যে সে জিনিসটা কোথায়? সৃষ্টি হয় কিসের দ্বারা? স্তরে স্তরে দেখ। যে কোন সৃষ্টি হোক না কেন highest or lowest, কিসের থেকে হয়? উপাদান কোথা থেকে আসে? কি করে হয়? কলা যদি না থাকে তাহলে সৃষ্টি হয় না, কেন না তখন সাম্য অবস্থা হয়ে যায়। বৈষম্য না হলে সৃষ্টি হয় না। এইটেই হচ্ছে আসল কথা। কাজেই বৈষম্য হতে গেলে কলা দরকার। নিষ্কল অবস্থা কোন্‌টা? শিবশক্তির সামরস্য সেটা হচ্ছে নিষ্কল অবস্থা, সেখানে সৃষ্টি নাই। শিবশক্তির বৈষম্য যেখানে, হয় শিবের প্রাধান্য নয় শক্তির প্রাধান্য—সেখান থেকে সৃষ্টি হয়। কিভাবে সৃষ্টিটা হয়? কিসের থেকে আসে? সৃষ্টি যে হয় তন্ত্রে তাকে বলে ভুবন। ভুবন মানে জগৎ নয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নয়। যেমনতর পরমাণু, পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক আসে, দ্ব্যণুক থেকে ত্রসরেণু আসে, ত্রসরেণু থেকে জাগতিক পদার্থ সব কিছু হল। এটাও হল ঠিক সেইরকমের কথা। সৃষ্টির মূলেতে কি? এই জগতে যত পদার্থ আছে, তার ভিতরেতে মূলটা কি? তারপরে তাদের মিল-মিশ্রণ করে কত কি হয় সে তো আলাদা। তাকেই বলে ভুবন—ভুবন মানে জগৎ নয় plane of existence নয়। সেটাই হচ্ছে মূল। যেমন পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক হয়, দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হয়। ত্রসরেণুর মধ্যে সমস্ত বৈচিত্র্য যেমন আছে পরমাণুর মধ্যে তা নাই। ন্যায়-বৈশিষেকের মধ্যে দেখ—একমাত্র পরমাণু—পার্থিব পরমাণু ও জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু—এই চারের থেকে অনন্ত কোটি।

সেই রকম জগতের যত কিছু সব ভুবনের থেকে তৈয়ার হয়। ভুবন হচ্ছে compound substance, সেই compoundটা ভুবনটা যদি নাকি analyse কর, ভুবনটা কি দিয়ে তৈয়ারী হয়? তত্ত্বের থেকে ভুবন সৃষ্টি হচ্ছে। তত্ত্ব কিসের থেকে সৃষ্টি হচ্ছে? তত্ত্ব আসছে কলা থেকে। কলার

মধ্যে সর্বপ্রথম কি, যার থেকে তত্ত্ব আসতে পারে? তত্ত্বটা immediately আসছে কিসের থেকে? বিসর্গ থেকে। বিসর্গটা হয় কিসের? বিন্দুর। বিন্দু না আসলে বিসর্গ হতে পারে না। বিন্দুটা ফেটে গিয়ে বিসর্গ হয়। বিন্দুটা হয় কিসের থেকে? কলা থেকে। দুই রকমের কলা আছে—এক হচ্ছে ক্রিয়াশক্তিরূপ আর এক হচ্ছে জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তিরূপ। ইচ্ছা-জ্ঞান হল উপরের—পুরুষের মধ্যে হল ইচ্ছা-জ্ঞান—প্রকৃতির মধ্যে হচ্ছে ক্রিয়া। ইচ্ছা-জ্ঞানের background-এ কি আছে? আনন্দ, আনন্দের মূলে আছে চিৎ। চিৎ-এর background-এ আছে কি? সত্তা। সেই যে সত্তা সেটা হচ্ছে অব্যক্ত। তারপরে চিৎটাই হচ্ছে প্রকাশরূপ এবং তারপরে লহরটা ওঠে, সেটাই আনন্দ। এই হল সচ্চিদানন্দ। সৎ-এর পূর্বে কে আছে ধরা যায় না। এইজন্য বলা হয় সৎ, চিৎ, আনন্দ। সচ্চিদানন্দটাই হচ্ছে ভূমা। সেই আনন্দের থেকে কি হয়? আনন্দের থেকে তরঙ্গ ওঠে। আনন্দটাই হচ্ছে যা ভবিষ্যতে প্রকৃতি হবে, তার মূল। চিৎ আর আনন্দ একটা জিনিসেরই এপিঠ আর ওপিঠ। যখন চিৎ-চিৎ, তখন আনন্দ নাই—খালি চিৎ-এ আনন্দ হয় না, আনন্দের ভিতরে লহর আছে, চিৎ-এ লহর নাই। চিৎটা হচ্ছে শান্ত প্রকাশ, আর আনন্দ হচ্ছে তার ভিতরে তরঙ্গ। জাগতিক তরঙ্গ নয়। জাগতিক কোন জিনিসই নাই তখন। তত্ত্ব পর্যন্ত নাই—এরকম ধরণের বুঝানোর জন্য বলা। তাহলে সৎ-চিৎ এটাই ধর পুরুষ এবং তাঁর যে শক্তি। জাগতিক হিসেবে নয়—জাগতিক হিসেবে প্রকৃতি-পুরুষ অনেক নীচের জিনিস। শিবশক্তি যদি বল সেও নীচের জিনিস। তুমি তো একেবারে কলার মূলে থেকে যাচ্ছ কিনা। সেই জিনিসই বটে তবে সেটার এতো rareified অবস্থা সেখানে ওসব কথা চলে না।

এই যে আনন্দটা, এই আনন্দটা যখন ক্ষুব্ধ হয় তখন কি হয়? তখন সৃষ্টি হয়। আনন্দ ক্ষুব্ধ না হলে সৃষ্টি হয় না। আনন্দের ক্ষোভটা যখন হয় তার কী রূপ হয় তখন? আনন্দের ক্ষোভ হয়ে কামনার উদয় হয়। সেটাই হল ইচ্ছা, ইচ্ছা হল মূলেতে নিজ স্বরূপ। যেখান থেকে উদয় হয় জ্ঞানের। এই পর্যন্ত হল পুরুষ। তারপরে যেটা সেটাই হল প্রকৃতি। চিৎ আর আনন্দ এই হল মূল—ঈশ্বর-ঈশ্বরী। আমাদের ঈশ্বর নন, সে ঈশ্বর তো অনেক নীচের। পরমেশ্বর নন। তারও উপরের সেই জাতীয় জিনিস। চিদ্-আনন্দ হল দুটো—চিৎ হল প্রকাশ, আর আনন্দ হল সেই প্রকাশ শক্তির লহর। এই হল চিদ্-আনন্দ। আর চিৎ-এর অতীত অবস্থা হচ্ছে সৎ—অব্যক্ত, সেটা প্রকাশ করা যায় না। সেটা সৃষ্টির মধ্যেও অব্যক্ত

অবস্থায় সবটার মধ্যেই আছে। মালার মধ্যে সুতোটা যেমন সব জায়গায় থাকে, তেমনি সৃষ্টির সব জায়গাতেই সৎটা আছে। তারপরে প্রকৃতি থেকে অন্তঃ প্রকৃতি, বহিঃ প্রকৃতি, এই ভাবেতে পুনঃ পুনঃ হতে থাকে এবং তখন হয় বিন্দু। এই যে বিন্দুটা হল সেটা যেন কালির একটা ফোঁটা বা drop। কালির সেই ফোঁটা থেকেই কত লেখালেখি হয়ে যাবে। সেই বিন্দুর থেকে সৃষ্টির সময় কি হয়? বিন্দু ফেটে যায়, বিসর্গ হয়। বিসর্গ থেকেই তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। যে কোন তত্ত্বই হোক না কেন—এল কোথা থেকে—মূলে কলা থেকে। কলা এল কোথা থেকে? কলা এল সৎ-এর থেকে। আদি কলা কোনটা? চিৎ। এই ভাবেতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই সৃষ্টির currentটা চলল, সেটা হল সচ্চিদানন্দের current। সেই সচ্চিদানন্দের current কি রকমের?

প্রথমে কলারূপে, তার পরেতে তত্ত্বরূপে। তারপর তত্ত্ব যেখানে শেষ হয় সেখানে কি হয়? তত্ত্ব আর যাতে না বাড়তে পারে? কূটাক্ষর হয়। কূটাক্ষর হয় কেন? যে currentটা চলছে সেটাকে resist করার জন্য। তা না হলে, অনবরত কেবল তত্ত্বই সৃষ্টি হবে, ভুবন হবে না। কূটাক্ষর যদি না থাকে, সৃষ্টি চলতেই থাকবে। এটা বন্ধ হলে তবে তো অহং থেকে ইদং হবে। অহংটা তো সে অবস্থাতে দাঁড়াতেই পারল না। সে অবস্থাতে কেন দাঁড়াতে পারল না? হকারের পরে current চলছে, কাজেই হকারের পরে current বন্ধ হয়ে যায়, কাজেই আদি 'অ'কার আর অন্ত 'হ'কার—এই নিয়ে অহং তৈয়ারী হল। এই অহংটাকেই আমরা আত্মা বলি। তাহলে দেখ প্রকৃত আত্মা তাকে analyse করে কি দেখা যাচ্ছে? কেবল আত্মা বললেই তো হল না। সমস্ত অহংটা নিয়ে কোন্ সময় আত্মা হয়? আদি কলা 'অ' অর্থাৎ চিৎকলা তার সঙ্গে অন্তকলা 'হ'কার—এই দুটো জিনিষ bracket-এ। অকার আর হকার তার মাঝখানে সব রইল—কলাগুলোও থাকল, তত্ত্বগুলোও থাকলা—এই দিয়ে অহং তৈয়ারী হল। এই যে অহংটা এই অহংটা হল পূর্ণ। এই অহংটা হল বলে তারপরে 'ইদং'টা আসবে। আর অহংটাকে যদি এখানে না resist করা যায়, রোখা যায়, তাহলে ইদং আসবেই না। তাহলে আর সৃষ্টি হয় না।

এই যে ইদং আসছে—এই ইদং আসছে কোথায়? অহং-এর থেকে ইদংটা আসছে। এটা আসছে কোথায়? এই হচ্ছে মহাকাল—মহাকালের ভিতরেতে। কাল হয়নি—এখনও কাল বলে কোন জিনিসই আসেনি। যাকে time বলে, Eternal time বলে—সে জিনিসের এখনও স্ফুরণ হয়নি।

মহাকালটা হয়েছে। সর্বপ্রথমে সে মহাকালে ইদং-এর আভাসটা আসে। ইদং হবে সেটা। এতক্ষণ পর্যন্ত ইদং ছিল না।

বোধ ও দীক্ষা

প্রশ্ন ঃ নিষ্কল থেকে কলার আবির্ভাব কি করে হয় ?

উত্তর—নিষ্কল থেকে কলার আবির্ভাব স্বভাবের থেকে হয়—আপনা আপনি হয়। নিষ্কলটাই হ'ল স্বরূপ। নিষ্কল মানে সর্বকলাক্ষয় নয়—সমস্ত কলা আছে অথচ কলা নাই। তাতে সব আছে অথচ কিছুই নাই। এই দুটো contradictory জিনিষ। যাবেও যখন, যতক্ষণ নিষ্কলে যেতে না পারছ ততক্ষণ পূর্ণত্ব হয় না। এমন কি শিব-শক্তির মধ্যেও কলা আছে। শিবের মধ্যে কি আছে ? শান্ত্যতীত কলা আর শক্তির মধ্যে ? শান্তি কলা। শিবশক্তি যে এটাও চিৎস্বরূপে। ঐ চিৎস্বরূপে, তাহলেও তাতে কলা আছে। নিষ্কল নিরাকার চৈতন্য ব্রাহ্মসমাজের মতো সেটা তো নয়। একটার মধ্যে স্পন্দ আছে, আর একটার মধ্যে স্পন্দ নাই। এই দুটোরও অতীত যে অবস্থাটা সেটা হচ্ছে নিষ্কল। কি করে বুঝবে তুমি ? সেখানে কিছুই নাই—কলাও নাই, ক্রিয়াও নাই, ভাবও নাই, কিছুই নাই—আবার নাই যে তাও নাই। আমাদের কোন রকম নিয়ম সেখানে খাটে না। parallel lines কখনও meet করে না—সেখানে parallel অথচ meet করে। 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'—এমন একটা জায়গা পূর্ণ থেকে পূর্ণ যদি subtract করা যায় তাহলেও বাকিটাতে পূর্ণত্ব থাকে।—আবার যদি যোগ কর তাহলেও বাড়ে না। তার বৃদ্ধিও নাই, হ্রাসও নাই। সবই আছে অথচ কিছুই তাতে নাই। যখন সেখানে পেঁছাবে তখন নিজেই বুঝতে পারবে সেটা। কাউকে বলতেই হয় না। সেখানে যেতে পার যাতে, তার জন্য নিজে নিজে চেষ্টা করো।

সৃষ্টির ধারা অনাদিকাল থেকেই চলছে। পিছনে নিষ্কল পড়ে আছে। সৃষ্টিটা হচ্ছে কিসের থেকে ? স্বাতন্ত্র্য থেকে—পূর্ণের খেয়াল থেকে। একে বলা হয় লীলা।

প্রশ্ন ঃ সংসারটা তাহলে সেই দৃষ্টি নিয়ে দেখলে......

বাবার পরিপ্রশ্ন ঃ সংসার কাকে বলছ ?

অবস্থায় সবটার মধ্যেই আছে। মালার মধ্যে সুতোটা যেমন সব জায়গায় থাকে, তেমনি সৃষ্টির সব জায়গাতেই সৎটা আছে। তারপরে প্রকৃতি থেকে অন্তঃ প্রকৃতি, বহিঃ প্রকৃতি, এই ভাবেতে পুনঃ পুনঃ হতে থাকে এবং তখন হয় বিন্দু। এই যে বিন্দুটা হল সেটা যেন কালির একটা ফোঁটা বা drop। কালির সেই ফোঁটা থেকেই কত লেখালেখি হয়ে যাবে। সেই বিন্দুর থেকে সৃষ্টির সময় কি হয়? বিন্দু ফেটে যায়, বিসর্গ হয়। বিসর্গ থেকেই তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। যে কোন তত্ত্বই হোক না কেন—এল কোথা থেকে—মূলে কলা থেকে। কলা এল কোথা থেকে? কলা এল সৎ-এর থেকে। আদি কলা কোনটা? চিৎ। এই ভাবেতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই সৃষ্টির currentটা চলল, সেটা হল সচ্চিদানন্দের current। সেই সচ্চিদানন্দের current কি রকমের?

প্রথমে কলারূপে, তার পরেতে তত্ত্বরূপে। তারপর তত্ত্ব যেখানে শেষ হয় সেখানে কি হয়? তত্ত্ব আর যাতে না বাড়তে পারে? কূটাক্ষর হয়। কূটাক্ষর হয় কেন? যে currentটা চলছে সেটাকে resist করার জন্য। তা না হলে, অনবরত কেবল তত্ত্বই সৃষ্টি হবে, ভুবন হবে না। কূটাক্ষর যদি না থাকে, সৃষ্টি চলতেই থাকবে। এটা বন্ধ হলে তবে তো অহং থেকে ইদং হবে। অহংটা তো সে অবস্থাতে দাঁড়াতেই পারল না। সে অবস্থাতে কেন দাঁড়াতে পারল না? হকারের পরে current চলছে, কাজেই হকারের পরে current বন্ধ হয়ে যায়, কাজেই আদি 'অ'কার আর অন্ত 'হ'কার—এই নিয়ে অহং তৈয়ারী হল। এই অহংটাকেই আমরা আত্মা বলি। তাহলে দেখ প্রকৃত আত্মা তাকে analyse করে কি দেখা যাচ্ছে? কেবল আত্মা বললেই তো হল না। সমস্ত অহংটা নিয়ে কোন্ সময় আত্মা হয়? আদি কলা 'অ' অর্থাৎ চিৎকলা তার সঙ্গে অন্তকলা 'হ'কার—এই দুটো জিনিষ bracket-এ। অকার আর হকার তার মাঝখানে সব রইল—কলাগুলোও থাকল, তত্ত্বগুলোও থাকলো—এই দিয়ে অহং তৈয়ারী হল। এই যে অহংটা এই অহংটা হল পূর্ণ। এই অহংটা হল বলে তারপরে 'ইদং'টা আসবে। আর অহংটাকে যদি এখানে না resist করা যায়, রোখা যায়, তাহলে ইদং আসবেই না। তাহলে আর সৃষ্টি হয় না।

এই যে ইদং আসছে—এই ইদং আসছে কোথায়? অহং-এর থেকে ইদংটা আসছে। এটা আসছে কোথায়? এই হচ্ছে মহাকাল—মহাকালের ভিতরেতে। কাল হয়নি—এখনও কাল বলে কোন জিনিসই আসেনি। যাকে time বলে, Eternal time বলে—সে জিনিসের এখনও স্ফুরণ হয়নি।

মহাকালটা হয়েছে। সর্বপ্রথমে সে মহাকালে ইদং-এর আভাসটা আসে। ইদং হবে সেটা। এতক্ষণ পর্যন্ত ইদং ছিল না।

বোধ ও দীক্ষা

প্রশ্ন ঃ নিষ্কল থেকে কলার আবির্ভাব কি করে হয়?

উত্তর—নিষ্কল থেকে কলার আবির্ভাব স্বভাবের থেকে হয়—আপনা আপনি হয়। নিষ্কলটাই হ'ল স্বরূপ। নিষ্কল মানে সর্বকলাক্ষয় নয়—সমস্ত কলা আছে অথচ কলা নাই। তাতে সব আছে অথচ কিছুই নাই। এই দুটো contradictory জিনিষ। যাবেও যখন, যতক্ষণ নিষ্কলে যেতে না পারছ ততক্ষণ পূর্ণত্ব হয় না। এমন কি শিব-শক্তির মধ্যেও কলা আছে। শিবের মধ্যে কি আছে? শান্ত্যতীত কলা আর শক্তির মধ্যে? শান্তি কলা। শিবশক্তি যে এটাও চিৎস্বরূপে। ঐ চিৎস্বরূপে, তাহলেও তাতে কলা আছে। নিষ্কল নিরাকার চৈতন্য ব্রাহ্মসমাজের মতো সেটা তো নয়। একটার মধ্যে স্পন্দ আছে, আর একটার মধ্যে স্পন্দ নাই। এই দুটোরও অতীত যে অবস্থাটা সেটা হচ্ছে নিষ্কল। কি করে বুঝবে তুমি? সেখানে কিছুই নাই—কলাও নাই, ক্রিয়াও নাই, ভাবও নাই, কিছুই নাই—আবার নাই যে তাও নাই। আমাদের কোন রকম নিয়ম সেখানে খাটে না। parallel lines কখনও meet করে না—সেখানে parallel অথচ meet করে। 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'—এমন একটা জায়গা পূর্ণ থেকে পূর্ণ যদি subtract করা যায় তাহলেও বাকিটাতে পূর্ণত্ব থাকে।—আবার যদি যোগ কর তাহলেও বাড়ে না। তার বৃদ্ধিও নাই, হ্রাসও নাই। সবই আছে অথচ কিছুই তাতে নাই। যখন সেখানে পেঁছাবে তখন নিজেই বুঝতে পারবে সেটা। কাউকে বলতেই হয় না। সেখানে যেতে পার যাতে, তার জন্য নিজে নিজে চেষ্টা করো।

সৃষ্টির ধারা অনাদিকাল থেকেই চলছে। পিছনে নিষ্কল পড়ে আছে। সৃষ্টিটা হচ্ছে কিসের থেকে? স্বাতন্ত্র্য থেকে—পূর্ণের খেয়াল থেকে। একে বলা হয় লীলা।

প্রশ্ন ঃ সংসারটা তাহলে সেই দৃষ্টি নিয়ে দেখলে......

বাবার পরিপ্রশ্ন ঃ সংসার কাকে বলছ?

(আমার উত্তর) ঃ যেখানে আমরা আছি অর্থাৎ এই জগৎ......

উত্তর ঃ—এইখানেই ভুল করলে—যেখানে আছ মানে কি ? তোমার বোধ তো নাই।

আমার উত্তর—আমার বোধ নাই ?

বাবার উত্তর ঃ—তাহলে সংসার বল কেন ?

এইখানেতে মুক্তপুরুষ রয়েছে—আনন্দেতে রয়েছে। সংসার তো মনে—বাইরে তো সংসার নয়—কি আশ্চর্য ! সংসার কোথায় ? সবই ভগবানের রাজ্য—এই mentality তো কৃত্রিমভাবেও আসছে না, তাহলে কি করে ধরবে বল। সংসার রয়েছে জাগতিক দৃষ্টিতে, রয়েছে যে ভগবৎ চর্চা করে না, জানে না তার জন্য। তোমার কাছে সংসার কিসের ? সংসার মনে করো কেন ? যখন অতি ছোটকে স্থান দিয়েছেন তিনি তখন সংসার মানে কি ? সংসারটাও তো তিনি। তিনি পিতা হয়ে রয়েছেন—জগৎ পিতা। তিনি ছেলে হয়ে রয়েছেন বাল-গোপাল—মা বলেন তো। তুমি সেইভাবে দেখনা. সেটা তোমার দোষ। তুমি সংসার করে রেখেছ বলেই সংসার। তুমি যদি তোমার ছেলেকে বাল-গোপাল বলে মনে করতে পার, তোমার পিতাকে যদি শিবরূপী পিতা বলে মনে করতে পার, নিজের গর্ভধারিণী মাকে যদি জগদম্বা বলে মনে করতে পার—তাহলে সংসার কোথায় ? বলতে পার পরমহংসের সংসার, যা আমার গুরুদেব বলতেন। এ দিক দিয়ে ত্যাগ করা হ'ল—ওদিক দিয়ে গ্রহণ করা হ'ল। সংসার যেমন আছে তেমনি থাকবে—লক্ষ লক্ষ বৎসর গেলেও এইরকমই থাকবে। বদলাবে তোমার outlook দৃষ্টিভঙ্গী। যদি তা না হয়, তাহলে তুমি পরমহংস হও, লাল কাপড় পরো, তাহলেও সংসারই থাকবে।

পরিপ্রশ্ন—আমি বলছি আপেক্ষিক ভাষায়, একটাকে লীলা আর এক-টাকে সংসার—এই দুটোর তারতম্য বুঝে নিতে চাইছি।

উত্তর—লীলা বলছি না, যে অবস্থায় গেলে তাকে লীলা বলে., ধরা যায়—যা আছে তাই আছে, তোমার বোধের উপর নির্ভর করছে। তোমার বোধ যদি না হয় লক্ষ বছরে লক্ষ বছর সংসারেতেই থাকবে। তোমার বোধ যদি শুকদেবের মতন তাহলে আর সংসার থাকে কোথায় ? শুকদেব ব্যাস-দেবের পুত্র ছিলেন। ব্যাসদেব পরম জ্ঞানী, মহাজ্ঞানী ছিলেন—আর তার পুত্র শুকদেব ছোট অবস্থায় উলঙ্গ থাকতেন। আমাদের দেশে এরকম আদর্শ দেখানো হয়েছে।

তুমি যদি নিজের ছেলেকে গোপালরূপে দেখতে পার, নিজের মাকে যদি

জগদম্বারূপে দেখতে পার সেটা তোমার বোধের উপর নির্ভর করছে তো—সংসার কোথায় তখন ? লৌকিক দৃষ্টিতে সংসার রয়েছে। সেই ছবি যদি খুলে যায় তাহলে সংসার কোথায় থাকে ? সেই ভালবাসার দৃষ্টি যদি খুলে যায়, নিজের ভিতরেতে সেটা কল্পনার দ্বারা দুই মিনিটের জন্য মনে মনে ভেবে নাওনা কেন, তখন সংসার কই ?

আসল জিনিস হচ্ছে দৃষ্টি খোলা। দৃষ্টিটা না খুললে তুমি মঙ্গলে যাও, যেখানে যাও সংসারই। লাল কাপড় পরেছ বলেই কি তুমি সংসারী নও ? তুমি নিজে চাকুরী করছ না বলেই কি তুমি সংসারী নও ? লাল কাপড় পরলেই কি তোমার ভেতরটা লাল হয়ে গেল কি ? তাতো নয়। আর তুমি ছেঁড়া কাপড় পরো, ভিক্ষা করো, তাহলে কি তুমি কিছুই নও ? ভগবানের দৃষ্টি এরকম কখনও হয় ? সবই নির্ভর করে তোমার উপর—তুমি যদি সকলকে ভালবেসে আপন করে নিতে পার তাহলে কোথায় সংসার ? লোকে তো তোমাকে বলবে সংসারী। এটা ঠিক কথা—কিন্তু তুমি তো সংসারী নও। তোমার ভেতরটা যদি সেই change এসে যায় তাহলে তুমি সংসারী কোথায় ?……

মা কি ছেলেকে মারে না ? আবার মা ছেলেকে রক্ষা করবার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্তও তো দেয়—তাহলে ? এগুলো তো কোনো দৃষ্টান্ত নয়। visionটাই বদলে যাবে যে। এখন তো formality বাইরের। বাড়ী ঘর ছেড়ে যেতে হবে—এমন তো কোন কথা নয়। বাড়ি ঘর ছাড়তেও হতে পারে, নাও ছাড়তে হতে পারে। বনে গিয়েও যদি তুমি বাড়ীর চিন্তা করো, খারাপ চিন্তা করো তাহলে তো তুমি সংসারীই তো রইলে। লাল-কাপড় পরলেই যে তুমি ভগবানের বিশিষ্ট recognition পেয়ে গেলে, তা তো নয়। Transformation হলে entire outlook will change।

পরিপ্রশ্ন ঃ স্বাতন্ত্র্য থেকে বা খেয়াল থেকে রাজা ভিখারী সাজছেন তাকে লীলা বলছি। কিন্তু যেখানে আমার ইচ্ছা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে কি বলব সেখানে—

উত্তর—সংসার—সেটাই সংসার।

স্বগতভাবে বল্লেন—দীক্ষা যখন পাবে তখন বাইরের কোনো formalityর দরকার হবে না—দীক্ষা হচ্ছে ভগবানের করুণা। রামঠাকুর মশাই বলতেন, দয়া পূর্বক ঈক্ষণ হচ্ছে দীক্ষা। সেই শুভ দৃষ্টিটা যখন তোমার উপর পড়বে তখন দীক্ষা হয়ে যাবে। বাইরের কোনো show রইল বা রইল না that does not at all matter। এখন দীক্ষা তত্ত্বটাকে বড় করে দেখে

না, কেবল ceremony-টাকে দেখায়। কাজেই সেই ceremony-টার এক জনের কাছে প্রয়োজন থাকতে পারে অন্য জনের কাছে প্রয়োজন নাও থাকতে পারে।

দীক্ষা জিনিসটা তো বোঝেই না লোকে। Formality করতে হয় করে। আসল জিনিস হচ্ছে সেই দীক্ষা না হলে তুমি পাবে কি করে! দীক্ষা না হলে লক্ষ কোটি বছরেও সে জিনিস পাবে না। কিন্তু দীক্ষা মানে আড়ম্বর, formality তাও তো নয়। বাইরের দীক্ষা তোমার না হতে পারে, ভেতরে তোমার হতে পারে। ভগবান যখন কৃপা করবেন, শক্তির সঙ্গে যোগ হবে, তা না হলে কি করে যাবে তুমি? তোমাকে শক্তি না দিলে তুমি যাবে কিসের জোরে?

পরিপ্রশ্ন এক জিজ্ঞাসু ঃ—আবার দুবার যখন দীক্ষা নেওয়া দেখি—

উত্তর—তাও হতে পারে—দরকার হলে নিতে পারে, আবার নাও নিতে পারে। বাইরের থেকে জিজ্ঞেস করতে নাই। ভাল ভাল মহাপুরুষের মধ্যেও দেখা গেছে এক জায়গায় দিয়েছে, আবার আর এক জায়গায় নিতে হয়েছে—যেমন এক মাষ্টারের কাছে পড়লাম তারপর আর এক মাষ্টারের কাছে পড়লাম, এমন তো হয়। তবে না হলেই ভাল হয়, তাতে সময়টা কম লাগে। নিষ্ঠাটা থাকে তো—একটা নিষ্ঠা থাকে। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি? দশ জন যদি থাকে গুরু—জগৎ গুরু। এত বই যে আমরা পড়ছি, প্রত্যেকটা থেকেই কিছু জ্ঞান লাভ করছি। যদিও সেটা লৌকিক জ্ঞান—একটাতে পাই বলে আর একটাতে পাইনা। তার কি কোনো অর্থ আছে? নিষ্ঠা যদি থাকে একের মধ্যেই সব পাওয়া যায়—জ্ঞান চাও, ভক্তি চাও, প্রেম চাও একজনের মধ্যে সব পাবে।

এই ধর নিগমানন্দ পরমহংস ছিলেন, তাঁর যোগী গুরু আলাদা, তান্ত্রিক গুরু আলাদা, তারপর জ্ঞানী গুরু, তারপর প্রেমিক গুর—৪ জন গুরু ছিলেন। তাঁরই শিষ্য শ্রীমৎ অনির্বাণ—একজন মহাপুরুষ। ১০ জন হোক, ২ জন হোক মূলে দীক্ষা একজনের কাছেই হয়। বাইরে যতই থাকুক না কেন, মূলে একটাই।

আর একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন ঃ এই যে শুনি, যতক্ষণ দীক্ষা না হয়, ততক্ষণ কিছুই হয় না।

উত্তর—ঠিক কথাই তো, তুমি দীক্ষা না নিয়ে যদি ডাকো তাঁকে, তাতে বৃথা যাবে না, কিন্তু প্রাপ্তিটা হবে না।

একজন না দিলে পাবে কি করে? এসব বুঝতে না পারলে মনে নানা

রকম সংশয় ওঠে। দীক্ষা না নিলে জিনিস পাবে কি করে? গুরু যদি তোমাকে জ্ঞানটা না দেন, তুমি জ্ঞানটা পাবে কোথায়? একজন গুরু যদি তোমাকে বর্ণপরিচয় না করিয়ে দেন, এইটা ক, এইটা গ, এখটা খ, আর তুমি যদি বল আমি জানিনা এটা, তাহলে তোমার কিছুই হবে না। একটা লিখলে এইভাবেই শিখতে হয়। তা যদি না শেখ তাহলে বড় লাইব্রেরীর (library) কোন বইপত্রই পড়তে পারবে না। তাহলে মাষ্টারের শেখানো ক, খ, গ, ঘ মানতেই হবে। তারপর মেনে নিয়ে তুমি দেখাতে পারবে যে, এই জ্ঞান দিয়ে বই পড়া যায়। মেনে না নিলে হয় না। আধ্যাত্মিক জগতে গুরুকরণও এইরূপ। যাঁর হাতে সে জিনিস আছে—যাঁর হাতে সে Power আছে সে যদি একটু না দেয় তাহলে তুমি পাবে কি করে? তোমার ঘরের সম্পত্তি তো নয়। ভগবান যখন অবতীর্ণ হন [দেহধারণ করেন] তখন তাঁকেও তো দীক্ষা নিতে হয়। সামাজিক হিসেবে একটা প্রয়োজন আছে, ভেতরেও প্রয়োজন আছে।

আবার ভেতর থেকে যদি সে জিনিসটা খুলে যায় তাহলে দরকার নাও হতে পারে। এই শুকদেব কে ছিল—সে শিশু অবস্থাতেও পূর্ণজ্ঞান পেয়েছিল। সকলেই তা নয়। ভিতরে আসল যে দীক্ষাটা, সেটা নিতেই হবে। সেটা বাইরের formality নয়—তাতে পয়সাও খরচ হবে না। তাতে জিনিস কিনতে হবে না, মন্ত্র পড়তে হবে না, তাহলে জিনিসটা তোমাকে মানতেই হলো। না মানলে তুমি পাবে না। আমার মধ্যে যে জ্ঞান আমি যদি তা না দিই তাহলে তুমি কি করে পাবে? সেইরকম ব্যাপার। বাইরের যে দীক্ষা সেটা হয়নি অথচ জিনিস পেয়ে গেছে, এরকম হতে পারে। ভেতরে হয়ে যায় সেটা। বাইরের জিনিস কিছুই দরকার হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না অথচ তাঁর প্রতি মায়ের এত কৃপা হ'ল কি করে?

জিজ্ঞাসু—আর একটা কথা, আমার স্ত্রী প্রায় মায়ের মূর্তি দেখতে পায় বিভিন্নরূপে—এসে বলে, আমার সঙ্গে বেরিয়ে আয়।

উত্তর—এতো ভাল। মাকে বলবে আমার তো ক্ষমতা নাই। তুমি আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাও—এইভাবটা রাখবে। এ হচ্ছে ভবিষ্যতে ভাল অনুগ্রহ হবে, তার পূর্বলক্ষণ। ভাল জিনিস—তাঁর নিত্য রাজ্যে নিয়ে যাবেন।

না, কেবল ceremony-টাকে দেখায়। কাজেই সেই ceremony-টার এক জনের কাছে প্রয়োজন থাকতে পারে· অন্য জনের কাছে প্রয়োজন নাও থাকতে পারে।

দীক্ষা জিনিসটা তো বোঝেই না লোকে। Formality করতে হয় করে। আসল জিনিস হচ্ছে সেই দীক্ষা না হলে তুমি পাবে কি করে! দীক্ষা না হলে লক্ষ কোটি বছরেও সে জিনিস পাবে না। কিন্তু দীক্ষা মানে আড়ম্বর, formality তাও তো নয়। বাইরের দীক্ষা তোমার না হতে পারে, ভেতরে তোমার হতে পারে। ভগবান যখন কৃপা করবেন, শক্তির সঙ্গে যোগ হবে, তা না হলে কি করে যাবে তুমি? তোমাকে শক্তি না দিলে তুমি যাবে কিসের জোরে?

পরিপ্রশ্ন এক জিজ্ঞাসু ঃ—আবার দুবার যখন দীক্ষা নেওয়া দেখি—

উত্তর—তাও হতে পারে—দরকার হলে নিতে পারে, আবার নাও নিতে পারে। বাইরের থেকে জিজ্ঞেস করতে নাই। ভাল ভাল মহাপুরুষের মধ্যেও দেখা গেছে এক জায়গায় দিয়েছে, আবার আর এক জায়গায় নিতে হয়েছে—যেমন এক মাষ্টারের কাছে পড়লাম তারপর আর এক মাষ্টারের কাছে পড়লাম, এমন তো হয়। তবে না হলেই ভাল হয়, তাতে সময়টা কম লাগে। নিষ্ঠাটা থাকে তো—একটা নিষ্ঠা থাকে। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি? দশ জন যদি থাকে গুরু—জগৎ গুরু। এত বই যে আমরা পড়ছি, প্রত্যেকটা থেকেই কিছু জ্ঞান লাভ করছি। যদিও সেটা লৌকিক জ্ঞান—একটাতে পাই বলে আর একটাতে পাইনা। তার কি কোনো অর্থ আছে? নিষ্ঠা যদি থাকে একের মধ্যেই সব পাওয়া যায়—জ্ঞান চাও, ভক্তি চাও, প্রেম চাও একজনের মধ্যে সব পাবে।

এই ধর নিগমানন্দ পরমহংস ছিলেন, তাঁর যোগী গুরু আলাদা, তান্ত্রিক গুরু আলাদা, তারপর জ্ঞানী গুরু, তারপর প্রেমিক গুর—৪ জন গুরু ছিলেন। তাঁরই শিষ্য শ্রীমৎ অনির্বাণ—একজন মহাপুরুষ। ১০ জন হোক, ২ জন হোক মূলে দীক্ষা একজনের কাছেই হয়। বাইরে যতই থাকুক না কেন, মূলে একটাই।

আর একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন ঃ এই যে শুনি, যতক্ষণ দীক্ষা না হয়, ততক্ষণ কিছুই হয় না।

উত্তর—ঠিক কথাই তো, তুমি দীক্ষা না নিয়ে যদি ডাকো তাঁকে, তাতে বৃথা যাবে না, কিন্তু প্রাপ্তিটা হবে না।

একজন না দিলে পাবে কি করে? এসব বুঝতে না পারলে মনে নানা

রকম সংশয় ওঠে। দীক্ষা না নিলে জিনিস পাবে কি করে? গুরু যদি তোমাকে জ্ঞানটা না দেন, তুমি জ্ঞানটা পাবে কোথায়? একজন গুরু যদি তোমাকে বর্ণপরিচয় না করিয়ে দেন, এইটা ক, এইটা গ, এখটা খ, আর তুমি যদি বল আমি জানিনা এটা, তাহলে তোমার কিছুই হবে না। একটা লিখলে এইভাবেই শিখতে হয়। তা যদি না শেখ তাহলে বড় লাইব্রেরীর (library) কোন বইপত্রই পড়তে পারবে না। তাহলে মাষ্টারের শেখানো ক, খ, গ, ঘ মানতেই হবে। তারপর মেনে নিয়ে তুমি দেখাতে পারবে যে, এই জ্ঞান দিয়ে বই পড়া যায়। মেনে না নিলে হয় না। আধ্যাত্মিক জগতে গুরুকরণও এইরূপ। যাঁর হাতে সে জিনিস আছে—যাঁর হাতে সে Power আছে সে যদি একটু না দেয় তাহলে তুমি পাবে কি করে? তোমার ঘরের সম্পত্তি তো নয়। ভগবান যখন অবতীর্ণ হন [দেহধারণ করেন] তখন তাঁকেও তো দীক্ষা নিতে হয়। সামাজিক হিসেবে একটা প্রয়োজন আছে, ভেতরেও প্রয়োজন আছে।

আবার ভেতর থেকে যদি সে জিনিসটা খুলে যায় তাহলে দরকার নাও হতে পারে। এই শুকদেব কে ছিল—সে শিশু অবস্থাতেও পূর্ণজ্ঞান পেয়েছিল। সকলেই তা নয়। ভিতরে আসল যে দীক্ষাটা, সেটা নিতেই হবে। সেটা বাইরের formality নয়—তাতে পয়সাও খরচ হবে না। তাতে জিনিস কিনতে হবে না, মন্ত্র পড়তে হবে না, তাহলে জিনিসটা তোমাকে মানতেই হলো। না মানলে তুমি পাবে না। আমার মধ্যে যে জ্ঞান আমি যদি তা না দিই তাহলে তুমি কি করে পাবে? সেইরকম ব্যাপার। বাইরের যে দীক্ষা সেটা হয়নি অথচ জিনিস পেয়ে গেছে, এরকম হতে পারে। ভেতরে হয়ে যায় সেটা। বাইরের জিনিস কিছুই দরকার হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না অথচ তাঁর প্রতি মায়ের এত কৃপা হ'ল কি করে?

জিজ্ঞাসু—আর একটা কথা, আমার স্ত্রী প্রায় মায়ের মূর্তি দেখতে পায় বিভিন্নরূপে—এসে বলে, আমার সঙ্গে বেরিয়ে আয়।

উত্তর—এতো ভাল। মাকে বলবে আমার তো ক্ষমতা নাই। তুমি আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাও—এইভাবটা রাখবে। এ হচ্ছে ভবিষ্যতে ভাল অনুগ্রহ হবে, তার পূর্বলক্ষণ। ভাল জিনিস—তাঁর নিত্য রাজ্যে নিয়ে যাবেন।

পরিত্রাণ ও ভগবান

১১ই অক্টোবর ১৯৭১—সকাল ৯টা ৫ মিঃ।
গুরুজীর ঘর—শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।

প্রশ্ন—'পরিত্রাণায় সাধূনাং'—এখানে সাধুদের পরিত্রাণের মানেটা কি?

উত্তর—যারা ভাল লোক—সৎলোক, ভগবানের আদেশ অনুসারে, ঋষি মুনিদের বাক্য অনুসারে চলতে ইচ্ছা করে, তাদের কাজে যারা বাধা দেয় সেই বাধাটাকে দূর করার জন্যই ভগবানের আবির্ভাব হয়।

ভগবানের আবির্ভাবটা কিসের জন্য হয়? 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়'—ধর্মটাকে establish করার জন্য। ধর্মটা establish হতে পারে না কোন সময়েতে? যে সময়েতে ভাল কাজ করেছে তার দণ্ড হ'ল—কি খারাপ করেছে অথচ সংসারে খুব উন্নতি হ'ল, এখন যা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ—এগুলো হচ্ছে বৈষম্য। এগুলো দূর করার জন্য তাঁরা অবতরণ করেন। 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্মসংস্থাপনার্থায়'—এই দুটো প্রক্রিয়ার দ্বারাই ধর্মসংস্থাপন হয়। ধর্মকে স্থাপন করা হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়, চঞ্চল হয় না ধর্ম। ধর্মটা চঞ্চল হলে সংসারটা ধ্বংস হয়ে যাবে। সেজন্য যখন চঞ্চল হ'য়ে পড়ে তখন তাঁকে দেহ গ্রহণ করতে হয়। তাতে জগতের পূর্ণ জিনিস আছে তার কিছু হয় না। বিচারক যেমন যে মন্দ কাজ করছে তাকে দণ্ড দিচ্ছে সেইরকম আর কি।

প্রশ্ন—ভগবানকে দর্শন করাই সাধুদের পরিত্রাণ এই রকম কি অর্থ করা যায়?

উত্তর—ভগবান বলে বোধ নাই যার, তার দর্শন দ্বারা কি পরিত্রাণ হবে?

পরিপ্রশ্ন—সাধুরও বোধ নাই?

উত্তর—কি বিপদ! কেউ অনুষ্ঠান করছে, তার তো সাক্ষাৎকার হয় নাই। সাক্ষাৎকার হলে তখন সেই ভগবৎস্বরূপে স্থিতি হয়, আনন্দ হয়। আর তা না হলে একটি মূর্ত্তি নিয়ে পূজা করছে, তাতে কোন কিছু হয় না তাতে বাইরের ভগবানের নিয়ম তখন কাজ করে। দুটো স্তর সাধারণতঃ বুঝা যায়—একটা স্তরেতে ভগবানের দ্বারা স্থাপিত যে নিয়ম 2+2 equal

to 4, 3—2 equal to 1—এই যে নিয়মগুলো, যোগ-বিয়োগের যে নিয়ম কর্মফলদাতা হয়—সেটা হলো তাঁর স্থাপিত নিয়ম, সেটা operate করবেই। দুষ্ট যে সেও তো জীব—সে দুষ্ট হলো কি করে ? অহংকার দ্বারা বিধৃত হয়ে তারপরে এই অবস্থাটা হয়েছে। স্বাধীনতাটা দেওয়া হয়েছে তো। মায়া জগতের মধ্যে আরোপিত স্বাধীনতা রয়েছে, তা না হলে কর্ম করে কি করে ?

আমি একটা কর্ম করলাম তার ফলটা তো ভোগ করতে হবে। সেইরকম ভাবে, জগতে যেটা নাকি Law'র দ্বারা governed সেখানে ভগবৎ স্বরূপের ভগবৎ প্রেমের এক কলাও নাই সেখানেতে—আমি বুঝি বা না বুঝি that does not matter, I am governed by that law, I am to work under that law। যারা নাস্তিক ভগবান মানে না সে lawটা তার উপরেও operate করে। এখন ধরো, আগুন পোড়ায়। একটা ভাল মানুষ আগুনে যদি হাত দেয় তাহলে তার হাত পুড়বে, একটা নিরপরাধ শিশুও যদি আগুনে হাত দেয় তাহলে তারও হাত পুড়বে—এগুলো হচ্ছে Law of nature—এ হচ্ছে মায়াজগতের ব্যাপার। এখানে ভগবান আছেন—কিন্তু তিনি ভগবান নন—তিনি হচ্ছেন কর্মফলদাতা। কিন্তু প্রকৃত সাধু যে হয় সে এর মধ্যে নাই। এরা হচ্ছে কর্মী সব, সব কর্ম অনুষ্ঠান করছে—জগতের জীব কর্মফল ভোগ করছে। যখন নাকি তার স্বরূপ খুলে যাবে তখন তাঁর আশ্রয় নিতে হবে কেন ? নিজের অন্তর শক্তিতে ক্রিয়া করবে। তখন মায়া বা মায়ার প্রশ্ন কোথায় ? মায়া যদি হল সেও ভগবানের ইচ্ছা। ভগবানের ইচ্ছা যদি হয়—মার যদি ইচ্ছা হয় ছেলেকে আমি শাসন করব, দণ্ড দেব—মারব তাহলে কি সেটা অপরাধ হয়ে গেল ? সে সে-চোখে দেখবে কেন ? তখন দেখবে যা কিছু হচ্ছে তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে, সব ঠিক ঠিক হচ্ছে। এ যখন ভিতরে প্রেমভাব আসবে তখন মায়ার question ওঠেই না। এ question ছেলেমানুষের question। এ question তো বাইরের জগতের—বাহ্য জগতের—এই জগতের question। যেখানে নাকি ভগবৎ প্রেম নিয়ে রয়েছে সেখানে এসবের প্রশ্ন কোথায় ? সেখানে সাধু-অসাধু চোদ্দ পুরুষের বাবার ক্ষমতা আছে যে তাকে touch করে ?

মা ছেলেকে মারছে খুব অথচ ভেতরেতে স্নেহে পূর্ণ—বাইরের লোক বলছে, মের না। কিন্তু বাইরের লোকের থেকে কি মায়ের স্নেহ কম ? বাইরের থেকে বুঝবার উপায় নাই।

আসল কথা হচ্ছে, 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামি অহং'—গীতার মধ্যে আছে অনন্যচিত্ত

হয়ে যদি তাঁর চিন্তা করে 'মাং পর্যুপাসতে'—সব রকম ভাবেতে আমার উপাসনা করে তার যোগক্ষেম বহন করি। যোগক্ষেম মানে তার যেটা দরকার সেটা আমি supply করে দিই অথচ সে আমার কাছে চায় নাই সেটা কিন্তু সেটা হয়, আর যেটা নাকি পেয়েছে ভাল, রক্ষা করতে হবে, আমি রক্ষা করি। এগুলো হচ্ছে খুব সত্য। এগুলো একটু উচ্চ অধিকার না হলে হয় না। নির্ভরের ভাবটা না আনলে এ জিনিসটা তো হয় না। বাইরে থেকে কষ্ট হচ্ছে, সে বলে তিনি দিচ্ছেন, সংশোধন করছেন আমায়—সংশোধন করতে গিয়ে কত কি করতে হয়—তাতে কি হয়? বাইরের লোক মনে করবে, বাঃ তিনি ভক্ত খুব কষ্ট পাচ্ছেন। বাইরের লোকেরও দোষ নাই। তারা বাইরে থেকে দেখছে। একজনকে রাজা করে দেওয়া হলো, কিন্তু রাজা হয়েও তাঁর কাছে পর হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ—গীতায় আছে যে আমাকে যেমনভাবে চায় আমি তার কাছে তেমনভাবেই আসি—এই কথার অর্থটা একটু বুঝিয়ে দিন।

উত্তর—ঠিক কথা। তিনি তো সবই—যার পিতা নাই, তার কাছে পিতা রূপে প্রকাশ পান, যার বন্ধু নাই তার কাছে বন্ধুরূপে প্রকাশ পান, মা হয়ে প্রকাশ পান—সব রূপে প্রকাশ পান তিনি। তাঁর কোন রূপ নাই, অথচ সব রূপ তাঁর। এই রূপ তাঁর এটা বললে limited হয়, তাহলে ভগবান হন না। কোন রূপ তাঁর নয়, এটা বললেও ভগবান হন না। সব রূপই তাঁর রূপ—এটা ধরা পড়ে কোন সময়ে? ভক্তর আকাঙ্ক্ষার উপরে। ভক্ত যে ভাবে তাকে চাইবে সেইভাব নিয়েই তিনি ফুটে উঠেন—যেভাবে চাইবে সেইভাবেই ফুটে উঠবেন। যা বলবে তাও তিনি, যা বলতে পার না, বুঝতে পার না, তাও তিনি। কাজেই সবই সত্য। Christian-রা ভগবানকে বাবা বলে, আমরা সব ভাব নিয়েই বলি—আসলে প্রেমটা থাকলেই হলো। আবার তিনি ভাবের অতীত—কোন ভাবের মধ্যে নন তিনি। যেভাবে যখন ডাকবে তখন সেইভাবেই তিনি সাড়া দেবেন। মা বলে ডাকলেও সাড়া দেবেন, সন্তান বলে ডাকলেও সাড়া দেবেন। আমরা limit করে ফেলি কিনা। তিনি তো limited নন—তিনি অসীম, অনন্ত। আমি আমার ভাব দ্বারা limit করি, তিনি সেটুকু স্বীকার করেন। আমি যদি বলি তিনি মা, তিনি মা। আমি যদি বলি তিনি আত্মা, তাও তিনি—He transcends everything। তিনি সর্বাত্মক—সর্বাতীত। এই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ। সবই তিনি —সবের অতীতও তিনি। সব মানে তো বিশ্বটা—বিশ্বটা তো তাঁর থেকেই স্ফুরণ হয়েছে। তার সমান হবে কি করে?

প্রেম ও কাম

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখায় পড়েছি গোপীদের প্রেমে অঙ্গস্পর্শ ছিল—এটা একটু বুঝিয়ে দেবেন ?

উত্তর ঃ অঙ্গস্পর্শ থাকতে পারে তাতে কি আছে ? ছিলই তো। ভাগবত পড়লে দেখতে পাবেন।

পরিপ্রশ্ন ঃ ভগবান তো চৈতন্যময়—চৈতন্যস্বরূপ—

উত্তর—চৈতন্যময় তাতে কি হয়েছে ? পাথরটা কি তিনি নন ? অঙ্গস্পর্শ তাতে কি আছে ? তা না হলে আস্বাদন হবে কি করে ? তার পরেতে আপনি যখন স্বরূপের ভেতরেতে যাবেন। তিনি তো চিৎস্বরূপ। কত ঋষি, মুনি যোগী হয়েছিলেন তাঁর অঙ্গস্পর্শ পাবার জন্য—কত ঋষি, মুনি যুগে যুগে তপস্যা করেছেন গোপীভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করার জন্য।

অঙ্গস্পর্শ হলে কাম হলো—কাম হলে খারাপ হলো। তোমরা যে কাম ধর সেই কামটাই যে প্রেম। কামৈব গোপরামাণাং প্রেম ইত্যভিধীয়তে—প্রেমৈব গোপারামাণাং কাম ইত্যভিধীয়তে'—গোপীদের যে প্রেম সেটাকেই লোকে বলে কাম। এই জন্য কৃষ্ণকে পেতে হলে কামতত্ত্ব—কামবীজ চাই। কামবীজ জানতো ? 'ক্লীং'—এটা হচ্ছে কামবীজ—এইটা দিয়ে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। তা না হলে পাওয়া যায় না। এটা তন্ত্রের রহস্য। কামভাব যখন তোমার আছে—লৌকিকভাব সেটা। কিন্তু অলৌকিকের মধ্যে যখন তুমি যাবে তখন কাম কোথায় ? সেই কামই তো প্রেম। কামৈব গোপরামাণাং প্রেম ইত্যভিধীয়তে—বলেছে না ? সেই সাকারভাবে যখন সাক্ষাৎকার হয় তখন কোনটা কাম আর কোনটা প্রেম ? Difference থাকে কোথায় বলো ? এখন কামটা হচ্ছে যাদের ভেতরেতে অভাব রয়েছে, তাদের জন্য। আর যখন দেখা যায় যে একটাই স্বরূপ—আমি হাত দিয়ে আমারই হাতটা স্পর্শ করলাম এটাকে কাম বলবে ? একটাই তো হাত—এটাও আমার, এটাও আমার। একটাই তো জিনিস। পুরুষ-প্রকৃতি দুটো নিয়ে পূর্ণ বস্তুটা হয়—+2&—2=O। আপ্তকাম, সুপ্তকাম জিনিসটা কি ? এগুলো বুঝতে চেষ্টা করো খুব শান্তভাবে, তাহলে বুঝতে পারবে। যখন প্রশ্ন করো তখন repulsive ভাব দিয়ে প্রশ্নটা ওঠে—বুঝবে কি করে ? স্বরূপ শক্তিটা না হলে কাম বুঝা যায় না। কামও যা, প্রেমও তাই—একই জিনিস—অথচ এক নয়। যেমন আকাশ আর পাতাল। বুঝতে পারলে ? কামও যা প্রেমও তাই অথচ একটা lowest, আর একটা

highest, আমাদের দেশে কত জিনিস ফুটে উঠেছে। কিন্তু না বুঝতে পারলে কিছু হয় না—গৌরব কোথায়? স্বরূপটা যখন প্রকাশ পায় তখন তার আস্বাদন হয় যেটা, সেটা কি ভাবেতে হয়? তিনটা অবস্থা তো আছে—কর্মের জন্য একটা স্তর—আর একটা স্তর হচ্ছে উপাসনা ও জ্ঞানের জন্য, আর একটা স্তর হচ্ছে ভক্তি—প্রেম সাধনার জন্য। এই স্তরগুলো সব আলাদা আলাদা আছে।

১৩ই আগষ্ট, ১৯৭১ সাল।
শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম, গুরুজীর ঘর।
সময় সকাল ৮—৩০ মিঃ

প্রশ্ন ঃ মানুষের উদ্দেশ্য যদি বলি পূর্ণ বিকাশ বা পূর্ণত্বলাভ বা মানুষের পূর্ণত্ব লাভের জন্য যে বিকাশ—সেটা কি উপায়ে সম্ভব?

উত্তর ঃ—পূর্ণত্ব কথাটা ছেড়ে দাওনা কেন, মানুষ যেভাবে থাকুক না কেন তার প্রকৃত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত—তার যেটা প্রকৃত স্বরূপ সেই স্বরূপটা প্রকাশ হওয়া। আমার এখন অপূর্ণতা আছে। আমার বিকাশ যখন পূর্ণ হয়ে যাবে অপূর্ণতাটা কেটে যাবে। ভগবৎ প্রাপ্তিই বল, ব্রহ্ম প্রাপ্তিই বল, তত্ত্বজ্ঞান বল, কত লক্ষ রকম নাম দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আসল কথাটা তো এই। যে বস্তু আমিতে নাই সে বস্তু আমি পেতে পারি না। আর যা আমাতে আছে তা ফুটে ওঠা দরকার। এখন ফোটেনি। আমার অভাব বোধ রয়েছে। যখন সে অভাববোধটা কেটে যাবে তখন আমার নিজের স্বরূপ জানতে পারবো এবং সেই স্বরূপ জানার সঙ্গে সঙ্গে যে অবস্থার বিকাশ হয়, পূর্ণতালাভ হয়ে যায়, তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল—এই হ'ল আসল কথা।

এখন জ্ঞান বল, ভক্তি বল, প্রেম বল, দ্বৈত বল, অদ্বৈত বল—এর মধ্যে included। আমার মধ্যে যা নাই তা আমি পাব না—আমার আশা করা উচিৎ নয়। আমার মধ্যে যা আছে যাতে আমি সেটা পেতে পারি সেটাই হ'ল আমার devotion। আর পেয়ে গেলেই আমার কাজ হয়ে গেল। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম—সব এসে গেল এর মধ্যে—কোন জিনিস বাদ যাবে না।

আমার পরিপ্রশ্ন ঃ এই অবস্থায় যেতে হলে বা এই অবস্থা পেতে গেলে আমার মধ্যে যে বাধা, যে আবরণ আছে তা কাটিয়ে উঠতে হবে।

উত্তর ঃ সত্যি কথা। সাধনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাধাগুলো সরে গিয়ে পথটা মুক্ত হয়ে যাওয়া।

আবার আমার পরিপ্রশ্ন ঃ সেই বাধাগুলো কাটাতে গেলে—প্রথম বাধাই তো আমাদের কাছে দেখতে পাচ্ছি আমার দেহ নিয়ে আলাদা ভাবটা—আমার কর্তৃত্ব......

উত্তর ঃ—প্রথম বাধাই হচ্ছে আমার এই দেহবোধকে কেন্দ্র করে যা কিছু চিন্তা করি সবই। কাজেই এই জিনিসটা প্রথমে কেটে যাওয়া চাই। অর্থাৎ দেহটা আমি নই—এ তো সত্যি কথা। সত্যি সত্যি দেহ আমি নই—তাহলে তার সঙ্গে যে সুখ-দুঃখ আছে সবই সত্য এবং তার ফল জন্মজন্মান্তর ভোগ করছি তো। দেহটা তো আমি নই—এটা সকলে চিন্তা করলেই বুঝতে পারি —আমি নিজে চিন্তা করলেও বুঝতে পারি—বাল্যেতে আমার দেহ আলাদা, যৌবনে দেহ আলাদা, বার্ধক্যে দেহ আলাদা। আমি এমন একটা জিনিস যা immutable, unchangeable কি সেটা এখনও আমি চিনি না। অথচ আমি বোধটা রয়েছে। সেটা বড় জিনিস। সেটা থাকা চাই। আমি বোধ আছে। কিন্তু যেটা ঠিক আমি নই সেটা অবলম্বন করে আমি বোধটা উঠছে। এর নাম দেহাত্মবোধ বল, materialism বল, সব এর under-এ এসে যায়। এটা স্বাভাবিক ভাবে কাটতে পারে। অস্বাভাবিকভাবে theory দেখে, বই পড়ে, বিচার করে কাটাতে পার। সেগুলো স্থায়ী হয় না। এই দেহটা আছে, ব্যথা লাগছে, ছট্‌ফট্‌ করছি ইত্যাদি এটাও স্বাভাবিক। ওটাও তেমনি স্বাভাবিক হবে। সেটা বই পড়ে শিখতে হয় না। সেটা যদি হয়ে যায়—সেটা যদি খুলে যায় তাহলে প্রত্যেকটা স্তরই হচ্ছে একটা ভূমি। সব জিনিস যদি খুলে যায় তাহলে তুমি নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিপ্রশ্ন ঃ দেহাত্মবোধ না হয় কাটলো আমার, একটা স্তর পেলাম, আমি দেহ নই এই বোধটা না হয় আসল......

উত্তর ঃ আমি দেহ নই এরকম ভাবে আসে না। বই পড়ার মত নয়। আমি দেহ নই এই বোধটা যখন আসবে—positive জিনিস যেটা, যে পথটা সে পথটা খুলে যাবে। এটা চিন্তা করে নাও। আমি দেহ নই একথা কেউ বলে দেবে না। কোন একজন মহাপুরুষ এসে বলে দিলেন তাতে তো তোমার পেট ভরবে না! তোমার নিজের ভিতর দিয়ে সেটা আসবে এই দেহটা আমি নই। এই দেহটা আমি নই এই language-এ বলারও দরকার নাই —ঠিক আমি এমন একটা জিনিস পাচ্ছি যা চিরদিন আমার কাছে গুপ্ত ছিল, যা এখন প্রকাশ হচ্ছে। প্রথম কি অবস্থাটা আসবে ব'ল।

দেহে যতক্ষণ আছি, দেহাত্মবোধ মুক্ত নই ঠিকই, কিন্তু behind that তার background-এ আর একটা জিনিস দেখতে পাওয়া যাবে, খুলে যাবে।

সেটা অনুভব করবে। যে তোমার সামনে আছে সেও টের পাবে না। সেই জিনিসটা কি? বাইরে তুমি যা পাচ্ছ তা ছেড়ে দাও। তোমার দেহের উপর মনের এমন action হচ্ছে যার ফলেতে এই দেহের কথায় তোমার প্রসঙ্গ উঠবেই না, দুই মিনিটের জন্য, এক মিনিটের জন্য। কি উঠবে? সেই জিনিসটা কি? সেটা বুঝবার জিনিস। সেটা স্থায়ী হলে পেয়ে গেলে সেটা। আমি বলছি এখানেতে জল রয়েছে, এখানেতে গরম লাগছে সবই থাকবে। আমি মুখে বলি বা না বলি দেহকে আশ্রয় করে তো এগুলো হচ্ছে সব। শীত, গ্রীষ্ম, সুস্থ, অসুস্থ যত কিছু বলি সবই তো দেহকে আশ্রয় করে। তখন এ জিনিস তোমার কাছে থাকবে না। অথচ তোমার কাছে positive experience আসবে। কি সেটা?

আমি উত্তরে বললাম—আনন্দের পরশ পাব।

বাবা প্রত্যুত্তরে বললেন, ওটা তো তোমার শোনা কথা। আনন্দ তো প্রত্যেক অবস্থায় থাকে। হাল্কা হয়ে গেলে একটা আনন্দ আসে। একটা পাখিকে যদি খাঁচায় রেখে দাও, আর খাঁচা থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়—আমি বললাম—উড়বে সে। একটা অবস্থা আছে সেই রকমের। দেহের প্রশ্নই উঠবে না তোমার অথচ তোমার জ্ঞান আছে সেটাই হল বিশ্বাস—শ্বাসটা থাকে না। ২ মিনিট কিংবা ৪ মিনিটের জন্য হলেও শ্বাসের ক্রিয়াটা automatically থাকবে না। শ্বাস নেবারও প্রয়োজন হবে না, ছাড়বারও প্রয়োজন হবে না, এ প্রশ্নই উঠবে না। এই অবস্থার নাম হ'ল বিশ্বাস। বিগত শ্বাস। আমি এখন যেটা বিশ্বাস বলি সেটা হালকা। আসল বিশ্বাসটা এখানে। ঈশ্বর ব'ল, ভগবান ব'ল, যত কিছু বল সেগুলো শোনা কথা—নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নেবে। তাহলে তোমার consciousness থাকবে, জ্ঞান থাকবে, সব থাকবে। অথচ এই সময় যে বোধ সেটা থাকবে না অর্থাৎ তুমি যে University-র officer, তুমি এত টাকার চাকুরী করছো, তোমার মনের কষ্ট, দেহের কষ্ট সবই তে দেহকে নিয়ে।

অথচ জ্ঞান থাকবে, বোধ থাকবে, হালকা হ'য়ে যাবে। এইটা হ'ল বিশ্বাস। এই অবস্থার সঙ্গে concurrent with this তখন একটা current তুমি অনুভব করবে। কি current অনুভব করবে? একটা বিজলীর মত—একটা shooting star এর মত প্রকাশ খুলে যাবে। একটা ক্ষণের জন্য। নাও খুলতে পারে। এটা পূর্বে হয়ে পরে সেটা হতে পারে। আবার এটার সঙ্গে সঙ্গেও হতে পারে। যেটাই হোক, তাহলে একটা জিনিস কি পেলে তুমি?

আমি বললাম—একটা উপরের দিকে যাবার গতি পেলাম—

উত্তর ঃ উপর নীচের কোন question নাই। এমন একটা জিনিস বিদ্যুতের চমক হলে যেমনতর হয় সেইরকম একটা ক্ষণের মধ্যে electric current কিংবা shooting star-এর যেমন হয় তেমন একটা উর্ধ্বগতি পেলে—সেটা একটা movement-এর জন্য। সঙ্গে সঙ্গে হতে পারে, একটার পর আর একটা হ'তে পারে, কিন্তু ওটা না হয়ে এটা হয় না। সেই যে অনুভব সেই অনুভবের মধ্যেই তুমি একটা বড় জিনিস পেয়ে যাবে।

কি বড় জিনিস পাবে? সেখানে দেখবে যা কিছু দেখছো সবই আমার reflection, mirror এ reflection-এর মত। এটা বুঝ। Plato যা শিখিয়ে গেছেন। সব মনে হবে যেন দর্পণের প্রতিবিম্ব। তোমার যে গতিটা সেটা হচ্ছে normal গতির বিরুদ্ধে—এইজন্যে তার নাম হচ্ছে উর্ধ্বগতি। Normal গতিটা কি? মাধ্যাকর্ষণে নীচের দিকে। এই গতিটার স্থিতি কোন জায়গায় গিয়ে হবে? এই গতিটা কোথায় পাবে তুমি? এরই নাম হচ্ছে ষট্‌চক্র ভেদ। ষট্‌চক্র নামটা তুমি জানবে না, জানবার দরকার নাই। একটা current-এর মতো পেয়ে যাবে, এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে না—এগুলোর কোনো দরকার নাই। চক্র পাবে না। কি পাবে? এক—একটা চক্রের মধ্যে কি জিনিস আছে? এক একটা জায়গায় তিনটে স্তর। চক্র তুমি পাবে না। কে পাবে? এক একটা চক্রের মধ্যে তিনটি করে অবস্থা আছে—ভিন্ন অবস্থা বুঝতে পারছো? কি তিনটে অবস্থা? চক্র অনেক রকম হতে পারে। ত্রিকোণ হতে পারে। চতুষ্কোণ হতে পারে, পঞ্চ কোণ হতে পারে। ষট্‌কোণ হ'তে পারে, অনেক রকম হ'তে পারে। একটা রাজ্য যেমন হয়—অনেক কিছু হ'তে পারে। কিন্তু চক্রটা মনে হচ্ছে an enclosure in the form of surrounding walls—আমার বাড়িটার surrounding wall সেটা গোলাকার হ'তে পারে, চতুষ্কোণ হ'তে পারে। কিন্তু প্রধান জিনিসটা কি? Enclosure করা আছে—একটা ঘেরা আছে। আর এই যে ঘেরাটা কি? মনে কর ঘেরাটা করেছি—ঘেরাটা কি দিয়ে করেছি—ইট দিয়ে করেছি, বা বাঁশ দিয়ে করেছি। এইখানে যে ঘেরাটা সে ঘেরাটা কি? সেই ঘেরাটার নামই হচ্ছে মাতৃকা, অ, আ, ই, ঈ, ক, খ, গ, ঘ যে রকমই থাক না কেন—এ গুলো বাইরের letter নয়—এ গুলো হচ্ছে শক্তি—শক্তির অবস্থা সেটা—এ গুলো মনে রেখো। এইটা হচ্ছে চক্র—চতুষ্কোণও হতে পারে, ষট্‌কোণও হতে পারে—এটা হচ্ছে common feature, বুঝতে পারলে? তারপরেতে যখন শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন কি হয়? চক্রের

মধ্যে যে উপাদানটা আছে সে গুলোর সমষ্টি হ'য়ে যাবে। বর্ণ যেটা বলছি—বর্ণ মানে তোমার প্রথম পাঠ reading-এর মধ্যে a, b, c, d মনে কোরোনা। বর্ণ মানে হচ্ছে রশ্মি। সেইগুলো দিয়ে ঘেরা করা আছে। সেই গুলো কি হবে এখন? সাধনার পরে?

আমি উত্তরে বল্লাম, সমষ্টি হবে বা গলে যাবে—

বাবা প্রত্যুত্তরে বললেন—আসল কথাটা বল্লে না—শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে যেমন শুনেছ একটা হচ্ছে আবরণ, আর একটা হচ্ছে বিক্ষেপ...আবরণটা রয়েছে বর্ণ দিয়ে। বর্ণ আছে ধর ক, খ, গ, ঘ, ঙ পাঁচটা বর্ণ আছে তখন কি হবে? কটা গলে গিয়ে—গলবে কিসে? যে শক্তির দ্বারা তুমি যাবে—গুরু দত্ত শক্তি বা নিজের মধ্যে জাগ্রত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তির দ্বারা 'ক' টা গলে যাবে। তখন ক থাকবে না, 'খ'তে মিশে যাবে। ক, খ মিশে একটা হবে। তারপরে 'খ' ও থাকবে না। এই রকম সমস্তটা গলে যাবে। গলে গেলে সে জিনিসটা কি হবে? 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' হচ্ছে মাতৃকা। এগুলো যখন গলে যায় তখন কি হয়? সেটা হলো নাদের পূর্বাভাস। আর এগুলো ছিলো কলা। এই যে 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' ছিল এর কি function ছিলো? To create বিকল্প in the consciousness—আর যখন সেটা নাদে converted হয়ে গেল তখন বিকল্প করাবার ক্ষমতাটা ক্ষীণ হয়ে গেল—সেইটি সমষ্টি হয়ে গেল। সমষ্টি হয়ে গেলে সেইটে flow করবে। কোথায় flow করবে? centre-এ। এই যে স্তরটা—পূর্বে স্তরটা ছিল মাতৃকা—আর এইখানে হয়ে গেল নাদ। নাদে পড়ল গিয়ে। নাদে যখন পড়ল তখন তুমি centre-এ গিয়ে পড়লে। Centre এ পড়লে কি হবে সেখানে? Centreটায় সমস্ত নাদটা গলে এক হয়ে গেল। Centre-এর ধর্মই হচ্ছে ঊর্ধ্বগতি। মাধ্যাকর্ষণ ভেদ হ'ল সেখানে। চট্ করে ওপরে ওঠে—সেখানকার কাজই হচ্ছে উজান আর কি—উত্তরবাহিনী গঙ্গা। সেখানে current না হলে যাবে কি করে তুমি—ঊর্ধ্বে উঠবে কি করে তুমি? কাজেই প্রথমে মাতৃকায় ঢোকো—সেই মাতৃকাটাকে নাদে পরিণত ক'র—নাদে পরিণত করে centre-এ যাও। বিন্দুতে। এতটা যে তুমি করলে সেটা কি? এটা হচ্ছে তোমার নিজের personal effort—এর নাম হচ্ছে সাধনা। কিন্তু বিন্দুটা উপরে উঠে যাওয়া সেটা তোমার কাজ না। সেটা হচ্ছে grace, কৃপা, মহাকৃপা।

কথাগুলো ভাল করে বুঝবার চেষ্টা কর। তোমার পুরুষকার যদি না থাকতো তাহলে উপরে উঠবে কি করে? Centre-এ গেলে তো ওপরে উঠবে। ট্রেনে গিয়ে বসবে তবে তো ট্রেন নিয়ে গিয়ে পেঁাছে দেবে। তুমি ঘরের মধ্যে

বসে থাকলে তো আর হবে না। কাজেই তোমাকে ট্রেনের কাছে যেতে হবে সেটা হ'ল তোমার চেষ্টা। আর ট্রেনটা তোমাকে আর এক station-এ নিয়ে যাবে তোমার পক্ষে সেটা হ'ল দৈব—সেইটার নাম হ'ল কৃপা।

এইভাবে জিনিসটা বোঝো। পুরুষকারটা যদি প্রথমে না করতে তাহলে তুমি উধর্বগতিটা পাবে কি করে। উধর্বগতিটা পাও—যেখানে currentটা উপরমুখে চলছে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নাও, তবে তো. উধর্বগতিটা, পাবে। এ কাজেই এটা হ'ল তোমার individual effort—আর যখন centre-এ গেলে তখন it ends your individual effort। Nature-এর higher current যেটা, সেটা তখন নিয়ে যাবে তোমাকে। তারপর আর একটা স্তরে পেঁছে গেলে। যেমন একটা স্তর ছিল—আর একটা স্তর। আর একটা রাজ্য আর কি। সে রাজ্যেও ঘেরা আছে—সে ঘেরাগুলো ঐ রকম বর্ণের দ্বারা। সেই বর্ণগুলো গলে গিয়ে একত্র করলে পরে পরে এ গুলো হ'লো সেই স্তরের সাধনা। তারপরেতে বিন্দুতে পরিণত হবে সেটা। তখন শ্রেষ্ঠ বিন্দুর সঙ্গে সেই বিন্দু এক হ'য়ে গেল। এক হ'য়ে গিয়ে ওপরে উঠে গেলে—সেখানে stationary থাকবে না। টপ্ করে উপরে উঠে যাবে। এইরকম করে তুমি আজ্ঞা চক্রে পেঁছে যাবে, একদিনেই যাও দশ দিনেই যাও, দশ বছরেই যাও সেটা Question নয়—স্তর হচ্ছে এই গুলো—যেতে হবে। সেখানে গিয়ে তুমি কি পেলে ? এই যে এতগুলো বিন্দু ছিল, সেই বিন্দুগুলো সমষ্টি হ'য়ে গিয়ে তারপরে যে শক্তি হয়েছে, সেই শক্তিটা dissolve হ'য়ে গিয়ে যে উধর্ব-গতি current হয়েছে, সেই current-এর অবসান হয় যেখানে সেই স্থানটার নাম হচ্ছে আজ্ঞাচক্র। তাহলে পঞ্চাশটা মাতৃকা শেষ হয়ে গেল। তখন come face to face with a great revolution—তখন খুলে গেল একটা জিনিস—বাঃ কি দেখতে পাচ্ছ! এইখানে এসে তুমি সহস্রারের দৃশ্যটা পেলে, এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি সহস্রারের কিছু জানতে না—বই পড়ে তো হবে না। সহস্রারের দৃশ্যটা তুমি পেলে—যাকে সহস্রার বলে—তুমি নাম জান বা না জান—তখন দেখবে যে একটা বিরাট সরোবরের মতন পড়ে রয়েছে। কে দেখছে ? তুমি দেখছো ? কিন্তু কখন দেখছ ? যখন সব বিন্দু এক হ'য়ে গেছে—যখন তুমি আজ্ঞাচক্রে গিয়ে পেঁছে গেছ। কাজেই তখন যে দৃষ্টিটা পেলে কিসের জোরে ? মাতৃকাগুলো ছিল—সে গুলো এক হয়ে গেছে বলে। এক হয়ে নাদে পরিণত হয়েছে। নাদ পরিণত হয়ে বিন্দু হয়েছে। বিন্দু ক্রমশঃ উধর্বমুখে গিয়ে চরম বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এতটা

মধ্যে যে উপাদানটা আছে সে গুলোর সমষ্টি হ'য়ে যাবে। বর্ণ যেটা বলছি —বর্ণ মানে তোমার প্রথম পাঠ reading-এর মধ্যে a, b, c, d মনে কোরোনা। বর্ণ মানে হচ্ছে রশ্মি। সেইগুলো দিয়ে ঘেরা করা আছে। সেই গুলো কি হবে এখন? সাধনার পরে?

আমি উত্তরে বল্লাম, সমষ্টি হবে বা গলে যাবে—

বাবা প্রত্যুত্তরে বললেন—আসল কথাটা বল্লে না—শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে যেমন শুনেছ একটা হচ্ছে আবরণ, আর একটা হচ্ছে বিক্ষেপ...আবরণটা রয়েছে বর্ণ দিয়ে। বর্ণ আছে ধর ক, খ, গ, ঘ, ঙ পাঁচটা বর্ণ আছে তখন কি হবে? কটা গলে গিয়ে—গলবে কিসে? যে শক্তির দ্বারা তুমি যাবে—গুরু দত্ত শক্তি বা নিজের মধ্যে জাগ্রত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তির দ্বারা 'ক' টা গলে যাবে। তখন ক থাকবে না, 'খ'তে মিশে যাবে। ক, খ মিশে একটা হবে। তারপরে 'খ' ও থাকবে না। এই রকম সমস্তটা গলে যাবে। গলে গেলে সে জিনিসটা কি হবে? 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' হচ্ছে মাতৃকা। এগুলো যখন গলে যায় তখন কি হয়? সেটা হলো নাদের পূর্বাভাস। আর এগুলো ছিলো কলা। এই যে 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' ছিল এর কি function ছিলো? To create বিকল্প in the consciousness—আর যখন সেটা নাদে converted হয়ে গেল তখন বিকল্প করাবার ক্ষমতাটা ক্ষীণ হয়ে গেল—সেইটি সমষ্টি হয়ে গেল। সমষ্টি হয়ে গেলে সেইটে flow করবে। কোথায় flow করবে? centre-এ। এই যে স্তরটা—পূর্বে স্তরটা ছিল মাতৃকা—আর এইখানে হয়ে গেল নাদ। নাদে পড়ল গিয়ে। নাদে যখন পড়ল তখন তুমি centre-এ গিয়ে পড়লে। Centre এ পড়লে কি হবে সেখানে? Centreটায় সমস্ত নাদটা গলে এক হয়ে গেল। Centre-এর ধর্মই হচ্ছে উর্ধ্বগতি। মাধ্যাকর্ষণ ভেদ হ'ল সেখানে। চট্ করে ওপরে ওঠে—সেখানকার কাজই হচ্ছে উজান আর কি—উত্তরবাহিনী গঙ্গা। সেখানে current না হলে যাবে কি করে তুমি—উর্ধ্বে উঠবে কি করে তুমি? কাজেই প্রথমে মাতৃকায় ঢোকো—সেই মাতৃকাটাকে নাদে পরিণত ক'র —নাদে পরিণত করে centre-এ যাও। বিন্দুতে। এতটা যে তুমি করলে সেটা কি? এটা হচ্ছে তোমার নিজের personal effort—এর নাম হচ্ছে সাধনা। কিন্তু বিন্দুটা উপরে উঠে যাওয়া সেটা তোমার কাজ না। সেটা হচ্ছে grace, কৃপা, মহাকৃপা।

কথাগুলো ভাল করে বুঝবার চেষ্টা কর। তোমার পুরুষকার যদি না থাকতো তাহলে উপরে উঠবে কি করে? Centre-এ গেলে তো ওপরে উঠবে। ট্রেনে গিয়ে বসবে তবে তো ট্রেন নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে। তুমি ঘরের মধ্যে

বসে থাকলে তো আর হবে না। কাজেই তোমাকে ট্রেনের কাছে যেতে হবে সেটা হ'ল তোমার চেষ্টা। আর ট্রেনটা তোমাকে আর এক station-এ নিয়ে যাবে তোমার পক্ষে সেটা হ'ল দৈব—সেইটার নাম হ'ল কৃপা।

এইভাবে জিনিসটা বোঝো। পুরুষকারটা যদি প্রথমে না করতে তাহলে তুমি উধর্বগতিটা পাবে কি করে। উধর্বগতিটা পাও—যেখানে currentটা উপরমুখে চলছে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নাও, তবে তো উধর্বগতিটা পাবে। এ কাজেই এটা হ'ল তোমার individual effort—আর যখন centre-এ গেলে তখন it ends your individual effort। Nature-এর higher current যেটা, সেটা তখন নিয়ে যাবে তোমাকে। তারপর আর একটা স্তরে পেঁছে গেলে। যেমন একটা স্তর ছিল—আর একটা স্তর। আর একটা রাজ্য আর কি। সে রাজ্যেও ঘেরা আছে—সে ঘেরাগুলো ঐ রকম বর্ণের দ্বারা। সেই বর্ণগুলো গলে গিয়ে একত্র করলে পরে পরে এ গুলো হ'লো সেই স্তরের সাধনা। তারপরেতে বিন্দুতে পরিণত হবে সেটা। তখন শ্রেষ্ঠ বিন্দুর সঙ্গে সেই বিন্দু এক হ'য়ে গেল। এক হ'য়ে গিয়ে ওপরে উঠে গেলে—সেখানে stationary থাকবে না। টপ্ করে উপরে উঠে যাবে। এইরকম করে তুমি আজ্ঞা চক্রে পেঁছে যাবে, একদিনেই যাও দশ দিনেই যাও, দশ বছরেই যাও সেটা Question নয়—স্তর হচ্ছে এই গুলো—যেতে হবে। সেখানে গিয়ে তুমি কি পেলে? এই যে এতগুলো বিন্দু ছিল, সেই বিন্দুগুলো সমষ্টি হ'য়ে গিয়ে তারপরে যে শক্তি হয়েছে, সেই শক্তিটা dissolve হ'য়ে গিয়ে যে উধর্ব-গতি current হয়েছে, সেই current-এর অবসান হয় যেখানে সেই স্থানটার নাম হচ্ছে আজ্ঞাচক্র। তাহলে পঞ্চাশটা মাতৃকা শেষ হয়ে গেল। তখন come face to face with a great revolution—তখন খুলে গেল একটা জিনিস—বাঃ কি দেখতে পাচ্ছ! এইখানে এসে তুমি সহস্রারের দৃশ্যটা পেলে, এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি সহস্রারের কিছু জানতে না—বই পড়ে তো হবে না। সহস্রারের দৃশ্যটা তুমি পেলে—যাকে সহস্রার বলে—তুমি নাম জান বা না জান—তখন দেখবে যে একটা বিরাট সরোবরের মতন পড়ে রয়েছে। কে দেখছে? তুমি দেখছো? কিন্তু কখন দেখছ? যখন সব বিন্দু এক হ'য়ে গেছে—যখন তুমি আজ্ঞাচক্রে গিয়ে পেঁছে গেছ। কাজেই তখন যে দৃষ্টিটা পেলে কিসের জোরে? মাতৃকাগুলো ছিল—সে গুলো এক হয়ে গেছে বলে। এক হয়ে নাদে পরিণত হয়েছে। নাদ পরিণত হয়ে বিন্দু হয়েছে। বিন্দু ক্রমশঃ উধর্বমুখে গিয়ে চরম বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এতটা

কাজ হ'ল বলে তো ! এই যে জিনিসটা এর মধ্যে কি আছে ? তোমার নিজের পুরুষকার আছে আর পিছনেতে divine grace আছে।

এই দুটো মিলিয়ে তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। যখন খুলে গেল তখন আর জিনিসগুলোর প্রশ্ন নাই—গলে গেছে সব—গলে গিয়ে ঊর্ধ্বগামী হয়ে সেখানে স্থিত হয়ে গেছে। তখন আর একটা জিনিস দেখতে পাবে সেটা হোলো সহস্রদল কমল। সেটা হ'ল উপরে।

এর পূর্বে তোমার কি কাজ ছিল ? কি কাজ করেছ এতক্ষণ ? তোমার নিজের স্বভাবের যে sourcesগুলো রয়েছে which are resultant of the মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেই জিনিসগুলোকে আশ্রয় করে, পুরুষকার করে, তারপর মাতৃকাগুলোকে গলিয়ে এক করে, তারপরে centreএ গিয়ে, তারপরে centreএ ক্রমশঃ uplift করে তখন সেই আলোটা খুলে গেল —চক্ষুটা খুলে গেল তা না হলে খোলে না কখনও—আপনাআপনি খোলে না। সেটা খুলে গেল—খুলে গেলে তখন তুমি কি দেখলে যেন ঠিক একটা সরোবরের মত—অথচ এমন একটা স্তর আছে, সেই স্তরেতে উপরের transcendent জিনিসটা reflected হয়। Transcendent জিনিসটা এখনও অনেক দূরে। কিন্তু তার reflectionটা দেখবার এখন অধিকার হোলো। এতক্ষণ তা হয়নি। এতক্ষণে কি লাভ হোলো তোমার ? তোমার যে egocentric complex ছিল সেটা চলে গেল—তোমার দেহকে নিয়ে—আজ্ঞা চক্র উঠা পর্যন্ত। এই রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ এ গুলো তো থাকল না। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এগুলো তো কিছুই থাকল না। খালি একটা প্রকাশ খুলে গেল, খুব উচ্চ অবস্থা সেটা। সেই অবস্থা পেলে তখন তুমি সরোবরের দর্শন পেলে।

মাধ্যাকর্ষণ কেটে গেছে। ঊর্ধ্বগতি হচ্ছে। ঊর্ধ্বগতি হওয়ার ফলে যে তোমার inner eye যেটা, occult vision যেটা, সেটা খুলে গেছে সেটা তোমারই vision। তুমি সেই চক্ষুর দ্বারা, সেই জ্ঞানের দ্বারা কোন একটা জিনিস তুমি দেখই। এই চোখ দিয়ে দেখবার জিনিস নয়—বাইরের জগতের কোন উপায় দ্বারা তার বিচার করা যায় না—যেমন অনেকে করতে চায় material scienceএর দ্বারা। কিন্তু এ জিনিস নয়। এই স্তরের জিনিসই নয়, আর একটা স্তরে পড়ে গেলাম যে। সেখানে কি পাচ্ছ তুমি ? কোনো একটা দৃশ্য পাচ্ছ। তখন দেখবে এ দৃশ্যটা যেটা সেটাও আসল জিনিস নয়, কোনো জিনিসের reflection-এর মতো—এইটেই হোলো সহস্রদল কমলের অবস্থা। যাকে আমি সাধারণতঃ বলি একটা সরোবরের মত—সরোবর হোলো

একটা অকূল পাথারের মতো। পড়ে রয়েছে কিন্তু তার centreএতে যেন একটা কমল ফুটে আছে। সেইটেকে লক্ষ্য করে তুমি যাচ্ছো। Centreএ আসা তোমার শেষ হয়ে গেছে। ঊর্ধ্বগতি তুমি লাভ করেছো, ঊর্ধ্বগতির পরে তুমি একটা বিরাট vision পেয়ে গেছ। তখন একটা জিনিস দেখতে পাবে যে একটা পথ রয়েছে। সেখানে তোমার উপাসনার মূল আরম্ভ হবে। তখন দেখবে যে তুমি গেছ সেখানে—তোমার নাম ছিল x, আর একজন তার নাম y ইত্যাদি—তখন সেখানে গিয়ে দেখবে x নাই, y নাই, z নাই, কেউ নাই। অথচ সব মিলে একটা 'অহং' রয়েছে—তাকে বলে নিত্য জীব, শুদ্ধ জীব—তোমার শুদ্ধ অবস্থা পাবে সেখানে। আর তুমি যার জন্য উপাসনা করে গেছ তারও একটা শুদ্ধ অবস্থা পেলে কিন্তু সেটাও reflection সেখানেতে—সেখানে তুমি শিব, শক্তি এবং জীবের পরম স্বরূপ সাক্ষাৎকার করলে। এইটাই হচ্ছে তোমার উপাসনার স্তর। এইরকম যেতে যেতে অনেক জিনিস আছে কিন্তু জিনিসটা এই—উপাসনার স্তর। দেহ বোধ তখন থাকে না। অন্য কল্পনাও নেই সেখানে। তারপর সেখানে গিয়ে তুমি কি পাচ্ছো ? সেখানে গিয়ে তুমি নিজেকে পাচ্ছো—শুদ্ধ জীবের রূপেতে যেই থাক না কেন, ক, খ, গ, ঘ যেই থাক না সেই একই জীব—কারণ মূলে একটাই জীব। সেই জীব তুমি হয়েছো। সেই জীব ভাবটা প্রাপ্ত হলে তখন দিব্য অবস্থার স্বরূপে দর্শন হবে। সেখানে পিতা মাতা আর কি—নিত্য পিতা মাতা—অনন্তকালের যিনি পিতৃস্বরূপ তাঁর দর্শন তুমি পাবে। তখন তার দিকেতে লক্ষ্য হয়ে গেল—দৃষ্টি হয়ে গেল। অধোদৃষ্টিও থাকল না, মধ্যদৃষ্টিও থাকল না, ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে গেল। এই যে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হলো এই ঊর্ধ্বদৃষ্টি হওয়ার পরেতে কি হয় ? এই ঊর্ধ্বদৃষ্টিটার ফলেতে কি লাভ হবে আমার ? অর্থাৎ সেখানে গেলে, এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখতে পাব, আমি জগৎ ছেড়ে উঠেছি তো। সেই জগতের থেকে একটা current যেমনতর প্রজা রাজাকে কর দেয় সেইরকম জিনিস তার দিকে এগিয়ে আসছে, তার কাছে না আসলে জগৎ চলে না। তাকে রক্ষা করে যাচ্ছে, তুমি সেটাকে দেখে যাচ্ছ কিন্তু তার প্রতি তোমার আসক্তি নাই। তোমার লক্ষ্য কোথায় ? সেই শিব শক্তির চরণের দিকে, ঊর্ধ্বমুখ হ'য়ে রয়েছে—তুমি অধোমুখ হওনি। অধোমুখ হ'লে তো আটকে যাবে। সেইটে যাচ্ছে কোথায় ? জগতের যা কিছু তার সারাংশটুকু যাচ্ছে কোথায় ? Tax আর কি। (আমি বললাম জগৎ পিতামাতার কাছে যাচ্ছে)। বাবা পরিপ্রশ্ন করলেন : সেখানে যাচ্ছে কেন ? সেখানে না গেলে সে জিনিসটা বোধরাজ্যে আসতে

পারে না। তাঁর কাছে touch না করলে বোধরাজ্যে আসতে পারে না। আর তুমি নিলে না মাঝখানে। তুমি সেই জিনিসের দিকে লক্ষ্য করলে না। তুমি লক্ষ্য করে থাকলে তাঁর দিকে। সেই যে রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ করে। তিনি কি সেটাকে ভোগ করেন?

তিনি ভোগ করেন না। করেন উপভোগ। কিন্তু আমরা যাকে ভোগ মনে করি তা নয়। তিনি দর্শন করেন মাত্র। এই দর্শনেতেই তাঁর ভোগ হয়ে যায়। এই ভোগ হয়ে গেলেই সেটা শুদ্ধ হয়ে গেল। তখন সে জিনিসটা নেবে আসে। ফিরে আসে। তার নাম হচ্ছে প্রসাদ। একেই প্রসাদ বলে। আমরা মার প্রসাদ খাই—সেইটেই হোলো প্রসাদ। তিনি দৃষ্টি দিলেই সে জিনিসটা purified হয়ে গেল। এর নাম হোলো সংস্কার—সংস্কৃত রূপ। তোমার কাছে এলো। তোমার কাছে আসবে, কেন না তুমি তো আগে পাওনি। এইবার হবে তোমার ভোগ—শুদ্ধ ভোগ। এই ভোগেতে মুক্ত অবস্থা আসবে—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'—এই হচ্ছে সেই ভোগ। এই ভোগ তোমার হবে। এই ভোগ যখন হয় তখন তোমারও কল্যাণ আর trinityরও কল্যাণ। কেন কল্যাণ? তিনটের মূলে যে একই........এর পূর্বেতে যতক্ষণ বুভুক্ষা রয়ে গেছে ততক্ষণ করতে পারে না। তখন তিনটে কি হয়ে যাবে? এই তিনটে—centreএতে গিয়ে meet করে। যেই centreএ গিয়ে meet ক'রল সেইটার নাম হচ্ছে ব্রহ্মরন্ধ্র। আর ওটার নাম ছিলো সহস্রদল কমল। এই সহস্রদল কমলের থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রেও তোমার প্রবেশ হ'য়ে গেল। ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ হলে আর এসব current থাকে না। বাইরের current সেখানে আসেনা। আসবে সহস্রার পর্যন্ত। সহস্রারে গিয়ে তার transformation হয়ে যায়—transformation, transfiguration যাই বল। তখন একটা current আসে দেহটাকে ভেদ করার—এই লক্ষ্যটা তখন থাকে। দেহটাকে ভেদ করা মানে? ব্রহ্মরন্ধ্র হয়ে দেহত্যাগ হয়। মানুষের মৃত্যুর সময় এটাই স্বাভাবিক হওয়া। কিন্তু সকলের তা হ'তে পারে না। দেহটা ত্যাগ হয়ে গেলেই তখন কি হয়? তোমার এই দেহের সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল সে সম্বন্ধটা তখন থাকবে না। কিন্তু দেহ থাকবে তোমার। কি দেহ থাকবে? এই যে দেহটা ছিলো এইটা স্থূল দেহ জাগতিক দৃষ্টিতে—এর মধ্যে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সব রয়েছে—দেহটা ভেদ হয়ে গেল, অথচ তুমি পরম স্থানে যেতে পারলে না এখনও। এখন তুমি মধ্যস্থ মানসিক জীব।

পথ পেয়ে গেলে। কোন পথ পেলে? সরল মার্গ—আর এতক্ষণ

তুমি কি লাভ করলে ? লাভ করলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে তোমার যে জগৎটা থাকে, সেটা থেকে তুরীয় রাজ্যের পথ আরম্ভ হ'য়ে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত তুরীয় রাজ্যে প্রবেশ করোনি, starting point তুমি পাওনি। এখন starting point পেয়ে গেলে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে থাকে কোথায় ? পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের পরেতে রয়েছে মন রাজ্য—স্বপ্নতে সে রাজ্য রয়েছে। তারপর সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে ডুবে রয়েছ। আবার জাগ্রতে —এই ঘোর প্যাঁচের মধ্যে ছিলে। এখন পেয়ে গেলে সরল পথ। এইটেই হোলো অর্দ্ধমাত্রার পথ। এইটে পেলে কোন জায়গায় ? এইটে হ'ল সরল পথ। অর্দ্ধ মাত্রা. অর্দ্ধ মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা করতে করতে যাবে সেখানে। একটা পেয়েছি নীচে আর একটা ওপরে। এখানে গেলে পূর্ণত্ব পেলে না।

সরল মার্গ পেয়ে গেলে। সরল মার্গের অবসান হ'ল। এখানে কি পাওয়া যায় ? এটাকে আমরা বলি যোগমায়ার রাজ্য। Camera-তে যেমন instantenous exposure থাকে সে যেমনতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম exposure নিতে পারে, এও ঠিক তাই। এইরকমভাবে ক্রমশঃ অর্দ্ধমাত্রা করতে করতে এমন একটা জায়গায় গেলে যেখানে গিয়ে আর তুমি ভাঙ্গতে পার না। তার চেয়ে ছোট exposure দেওয়া তোমার আসবে না। সম্ভব নয় তোমার পক্ষে, তোমার সেইটে highest exposure। সেখানে ত্রিমূর্তি রয়েছে। শিব, শক্তি ও জীব। তারপরেতে কি হবে তোমার ? কি কাজটা হবে ? তুমি রয়েছ, তোমার ওপরে শিব শক্তি রয়েছেন—নিত্যরূপে রয়েছেন। তুমি যেখানে গেলে সেখানে লক্ষ বছর সাধনা করেও যেতে পারবে না। কিন্তু পূর্ণত্ব নয় সেটা। কলা রয়েছে। পূর্ণত্ব নয় কেন ? যেখানে মন নাই—মন সূক্ষ্মভাবে রয়েছে। কিন্তু মন নাই তা তো নয়। মন থাকলে time, space, causality সব থাকে। সেখানেও আছে। তুমি এমন জায়গায় গেছ সেখান থেকে সমস্ত বিশ্বের সব existing বোধ করতে পারবে। কিন্তু তাহলেও তা পূর্ণত্ব নয়। একেবারে এক—এর নাম হচ্ছে পূর্ণ। Integration যেটা। তিনটে জিনিস রয়েছে তো—trinity বলে তাকে—পিতা, মাতা, সন্তান। সমস্ত সংসারই রয়েছে। শুদ্ধ ভাবেতে নাই। এখানে শুদ্ধভাবে আছে কিন্তু তোমার মনোরাজ্যের ভেদ হয় নাই।

সবচেয়ে সূক্ষ্মতম অবস্থা। তারপরে তোমার মনটা ত্যাগ হয়ে যাবে। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে হতে পারে। দুটো উপায় প্রধান আছে।

দুটো জিনিস হতে পারে। মন ত্যাগ হতে পারে। কি করে ? এক

হচ্ছে পরম শক্তি পরম শিব, শিব শক্তি দুটোতে এক হয়ে গেল অথবা একবারে।

সেখানে জিনিস যেটা পাবে সেটা হচ্ছে উন্মনী! উন্মনীতে কলা শেষ হয়ে গেল। ওখানে তোমার কলা ছিল যেটা highest level কি কলা ছিল? শান্তি কলা এবং শান্ত্যতীত কলা। এই হ'ল চরম। পাঁচটা দিক তো। পাঁচটা কি? নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, শান্ত্যতীত। সেটা যখন শেষ হয়ে যাবে সেটা নিষ্কল। এই নিষ্কল, যখন পেলে তখন আর মন নাই। 'মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ'—মনের অতীত অবস্থা। অখণ্ড বিরাট চৈতন্য পড়ে রয়েছে। সেখানেতে সাকার—নিরাকারের conflict নেই। 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে'—এই হোলো সেই জায়গা। 'সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা'—তই হোলো আকস্মিক কাশী।

পরিপ্রশ্ন ঃ এই যে সরল মার্গ পাওয়ার কথাটা যে বললেন......

উত্তর ঃ এতো বললাম পথের কথা। কিন্তু বিনা পথেও সে জিনিস পাওয়া যায় তো। নিশ্চয় পাবে, নিশ্চয় পাবে, নিশ্চয় পাবে। এখানে ক্রমটা রয়েছে, বলছিলাম না এখান থেকে তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে। হেঁটে যেতে পার, গরুর গাড়ীতে যেতে পার, সাইকেলে যেতে পার, train-এ যেতে পার, air-এ যেতে পার। যেতে হবে তো। যেতে time লাগবে তো। যত সূক্ষ্ম উপায়ে যাবে তত সময় কম লাগবে। তারপরেতে না গিয়েও তুমি যেতে পার—আমি তো সেখানেই আছি। সেখানেই আমি, মানে কলকাতায় আছি। যেখানেই বলবে সেখানেই আছি। এইটে হচ্ছে highest অবস্থা। পথের দরকার নাই। এটা হচ্ছে কোনটা? বললাম না, এক টাকা ভাগ ক'রে ক'রে কম ক'রে যাচ্ছি, কিন্তু এক টাকা ধার নিয়ে এক টাকাই যদি শোধ করে দেই একসঙ্গে তাহলে আর ভাগ করার প্রশ্ন থাকে না। ক্রম থাকে না। তেমনিতর পথের দরকার যেখানে নাই তখন time থাকে না, space থাকে না, মন থাকে না, কিছুই থাকে না। এক টাকা নিয়ে যদি এক টাকাই ফিরিয়ে দাও তাহলে আর question কোথায়? এই জিনিসটা হবে। চিন্তা কর, চিন্তা না করলে ধরতে পারবে না।

পরিপ্রশ্ন ঃ আমার প্রশ্নটা যা জেগেছে তা হচ্ছে এই—আপনি এখন যে সরল মার্গের কথা বললেন আর পূর্বে যে সরল মার্গের কথা শুনেছি অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষু যখন লাভ হ'ল......

প্রত্যুত্তরে বললেন—যে কথা আমি এখন বলছি সেখানে তো মার্গই নাই...

আমি আবার পরিপ্রশ্ন করলাম ঃ এটা তো আমি বুঝেছি বুদ্ধির দিক থেকে—মনের দিক থেকে। আমার জিজ্ঞাসা হ'ল আপনি বললেন—শুদ্ধ জীব শিব শক্তিকে দেখছে......

বাবা আবার intervene করে বললেন ঃ দুটো দিক আছে—তিনটের থেকে সেটাকে পাওয়া যায়, আবার তিনটিকে দুটোতে convert করে নিয়ে পাওয়া যায়।

আমার পরিপ্রশ্ন ঃ আমার আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যে গতিটা হ'ল—এই গতিটাকে কি বলব ? সে গতিটাকে কি সরল বলব না ?

উত্তর ঃ সেটাও সরল। এক সরলেতেই তোমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু এক একটা চক্র ভেদ করে করে যদি যাও তাহলে সরল মার্গ পাবে না। সেখানে সরল মার্গে যাওয়ার জন্য centre-এ যেতে হবে। সেই যে চক্রের দলগুলো আছে সেগুলো সংহার করতে হবে, নাদে পরিণত হবে। নাদ থেকে যখন বিন্দুতে যাবে তখন সরল পথ পাবে। সেটা তো খণ্ড সরল। কিন্তু যেটা directly নিয়ে যাবে (আনাপান মার্গে) সেখানে এর প্রশ্নই ওঠে না! এক ধাক্কাতে তুমি মূলাধার চক্র থেকে আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত হবে। সেটা দশ মাসে করুক, এক বৎসরে করুক, দশ বৎসরে করুক যখনই করুক সেখানে intermediate station-এর কোন question নাই। সেই current-এই নিয়ে যায়।

উপাসনার স্বরূপ

প্রশ্ন ঃ উপাসনা কিভাবে হয় ? (শুদ্ধ জীব শিব ও শক্তিকে দেখছে সেই অবস্থায় উপাসনা......) গুরুজী পরিপ্রশ্ন করলেন ঃ উপাসনা কিভাবে হয় বল।

আমি আবার বল্লাম সমীপে আসীন তো বুঝলাম......

উত্তর ঃ শুদ্ধ জীব নিজের পিতামাতাকে দেখতে পাচ্ছে। তখন কি হয় ব'ল।

আমি বললাম—শুদ্ধ জীব নিজের পিতামাতাকে দেখতে পাচ্ছে। তার কিছু করণীয় নাই। নীচের থেকে যা কিছু নিবেদন হচ্ছে।

গুরুজী উত্তরে বললেন ঃ উপ আসন—সমীপে বসা। সেখানে তো সমীপে হচ্ছে। তখন দাঁড়াচ্ছে কোন জিনিসটা ? নিজের পিতামাতার দিকে

দৃষ্টি রয়েছে। পিতামাতার দিকে দৃষ্টি হলে, পিতামাতার শক্তিটা তার মধ্যে তো আসবে। পিতামাতার দিকে তাকিয়ে থাকে সেইটাই বা কে এবং পিতা-মাতার থেকে কোন জিনিসটা সে পায়? পিতামাতা তো সাক্ষাৎভাবে কিছু দেন না। অথচ তার কিছু প্রাপ্তি আছে পিতামাতার থেকে। আমি দিলাম না অথচ আমার থেকে তুমি পেয়ে গেলে, এ জিনিসটা রয়ে গেছে কিনা। একটা জিনিস আমার কাছ থেকে তুমি পেয়েছ। আমি তোমাকে দিলাম যে তা নয়। পিতামাতা থেকে সে পাবে কিন্তু পিতামাতা দিচ্ছে না তাকে। তার দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি থেকে আকর্ষণ হয়ে আসবে। গাভীর স্তনেতে দুধ আছে। বাচ্ছাকে দেখলেই দুধটা অধোমুখ হ'তে চেষ্টা করে—ইচ্ছা করে দিতে পারে না—ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন নাই সেখানে। Automatically হয়। গাভী যদি বাচ্ছাকে না দেখতে পায় তাহলে তার বাঁট টানলে দুধ আসবে না। বাচ্ছা দেখলে যে স্নেহটা বিগলিত হয় সেটা দুধ রূপে প্রকাশ পায়। যখন দোহন করে তখন বাচ্ছাকে সামনে রেখে করে কিংবা একটু খাইয়ে নিয়ে করে। এটা একটা দৃষ্টান্ত। সমীপে বসাও সেইরকম জিনিস।

উপাসনা হবে কোন সময়? কোন সময় উপাসনা হবে? কি রকম attitude থাকলে উপাসনা হবে?

আমি বললাম ঃ শরণাগতির attitude থাকলে উপাসনা হবে। গুরুজী বললেন—আমি শরণাগতির কথা বলছি না। শরণাগতি তো অনেক পরের কথা। তুমি যার presenceটা feel করো, যার সন্নিহিত হয়ে আছো। যার দিক উন্মুখ হয়ে—এটা থাকলে যার থেকে যে জিনিস আসবার সেটা automatically আসবে। মাতৃভাব নিয়ে তাঁর দিকে উন্মুখ হ'য়ে থাকলেই সন্তানের প্রতি উন্মুখভাব যেটা, সেটা মায়ের মধ্যে আসবেই। জোর করে করতে হয় না। আপনা আপনিই হয়। তোমার ভিতরে যদি উন্মুখ ভাব না থাকে তবে মায়ের ভেতরেও সন্তানের জন্য উন্মুখ ভাবটা আসে না। এই যে প্রাকৃতিক নিয়ম এইটাকে অবলম্বন করে উপাসনা করতে হয়। মা কি ইচ্ছা করে দেন? তা না। ইচ্ছা করতে হয় না। স্বাভাবিক হয়ে যায়। শিশু যদি মাকে মা বলে ডাকে তখনই মায়ের স্নেহ বিগলিত হয়।

সেই উন্মুখ ভাবটা মায়ের ভেতরে আসা চাইতো! তা না হলে স্নেহটা বিগলিত হয়ে আসবে কি করে? একটা Law—প্রাকৃতিক নিয়ম। মা যদি না দেন—এ প্রশ্ন ওঠে না। তাঁর দিকে উন্মুখ হয়ে থাকো। উন্মুখ ভাবটা না থাকলে হয় না। সব সময় শিশু ভাবটা রাখতে হয় যাতে মার স্নেহটা পাওয়া যায়। তুমি পূর্বেই যদি জ্ঞানী সেজে যাও তাহলে সে জিনিস হয়

না। মার যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তোমার দিকে সেটা যদি না থাকে তাহলে সে জিনিস হয় না। মার যে তোমার দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণ সেটা যদি না থাকে তাহলে highest realisation কোত্থেকে আসবে তোমার? এই যে জপ করে, যত কিছু করে ঠিক ভাবে যদি করতে পারে সে এই জিনিসটা পায়, আমাদের মা ডাকটাইতো ঠিক প্রকৃত ডাক হয় না। একটা শেখানো ডাক হয়। শিশুর ডাক ডাকতে হবে। তোমার দৃষ্টিটা, ভাবটা সব মার দিকে উন্মুখ হওয়া চাই। খালি নকল করলে তো হবে না। মায়ের স্নেহটা আপনা আপনি এসে যায় তখন। মাকে ইচ্ছা করতে হয় না। ইচ্ছা স্বভাব।

সম্বোধন ও বোধন

১৪ই অক্টোবর ১৯৭১ সাল গুরুজীর ঘর, শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।

সন্ধ্যাবেলা—আরত্রিকের সময়।

তুমি অবস্থাটা কোন সময়ে আসে? আর তুমি বোধটা কোন সময় আসে?

আমাকে উদ্দেশ্য করে বাবা আপনা আপনি বলতে শুরু করলেন: চৈতন্যের একটা স্ফুরণ রয়েছে এবং সে চৈতন্য খুব distant—তুমি 'তিনি' বলে ধরছো। কিন্তু সে চৈতন্যের স্ফুরণ যখন পাওনি সে অবস্থাও তো আছে। সাধারণ লোক কি অবস্থায় আছে? সাধারণ লোক কি 'তিনি' অবস্থা ধরতে পারে? 'তিনি' বললেই মনে হোলো ভগবান, স্বরূপের নিদর্শন পেয়েছে সে। তা না হলে 'তিনি' বললেন কি করে? কিন্তু ধরো যে তাঁর নিদর্শন মোটেই পায়নি এখন পর্যন্ত অথচ চিন্তাশীল, সে কি পায়? ভগবান স্বরূপের নিদর্শন যখন পায়, জাগরণটা যখন প্রথম হয়, তখন দেখা যায় তিনটে স্তর। কিন্তু জাগরণ যার হয়নি? সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের, বিজ্ঞানের আলোচনা করছে, সব দিকই করছে সে, তাতে কি হোলো? 'তিনি' আসবে কোন সময়? 'তিনি' মানে চৈতন্যোচিত বস্তু তো! চৈতন্যের বিকাশ যে দেখতে পাচ্ছে না এখনও পর্যন্ত। সে বিকাশের ক্রমটা তুমি বলছো। কিন্তু বিকাশটা কি করে হচ্ছে সেটা বলো আগে। 'তিনি'র পূর্বে কি অবস্থাটা আসা দরকার? সে অবস্থায়ই হোলো আমরা যাকে বলি প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তার পূর্বে তো প্রাণের কোনো evidence-ই পাই না। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলে তখন প্রথম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষে আসতে হয়। মধ্যম পুরুষ থেকে উত্তম

পুরুষে আসে। প্রাণই যেখানে প্রতিষ্ঠা হয় নাই, বিশ্ব, জগৎ আছে, কত রকম বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের আবিষ্কার করছে, সেটা কোন অবস্থা? প্রাণের জাগরণ তো হয়—কি দিয়ে হয় বল? সর্বপ্রথম যে আভাস পাওয়া যায়, সেটা কি ভাবে পাওয়া যায় বল?

চৈতন্য আছে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপৃত ক'রে। সর্বত্র জড় রয়েছে। জড়ের ভিতর থেকে চৈতন্য ফুটে উঠেছে। এটা হোলো 'তিনি' পাওয়া। 'তিনি'-কে এইভাবে পাওয়া যেতে পারে। তারপর সে চৈতন্যের কি হয়? তারপর হয় 'সম্বোধন'। চৈতন্যের বিকাশ যতক্ষণ উপলব্ধির ভেতরে না আসে, ততক্ষণ 'সম্বোধন' হয় না। তারপরে হয় সম্বোধন। 'সম্বোধন' মানে? 'সম্বোধন' মানে তাঁকে জাগান। 'সম্বোধনের' পূর্বে ছিল সে জড়ের থেকে উন্মেষ প্রাপ্ত মাত্র—প্রথম পুরুষ অর্থাৎ এই বোধ হচ্ছে যে একটা বিরাট, ব্যাপক চৈতন্য আছে, সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে। এই বোধ এসে গেলে বোঝা গেল 'তিনি'তে এসে গেছে। তারপরে তাকে 'বোধন' করতে হয়। 'বোধন'টা কি? আমরা ব্যাকরণের ভেতরেতে শব্দরূপেতে প্রথমে বলি নর, নরৌ, নরাঃ। আর সম্বোধনটা হোলো 'হে নর'। এও ঠিক সেই রকম। সম্বোধন মানে কি? (ভালো করে বোঝো, বড়ই কাজের জিনিস) প্রথমটা হোলো কি? প্রথমটা আমার ধারণা, সর্বত্র জড়ই জড়, জড়ই জড়, তার ভিতরে শক্তির খেলা আছে—নানারকম বৈচিত্র্য আছে, এ সব বাইরের দিক। এ সব হ'য়ে গেলে তারপর এমন একটা অবস্থা আসে—এই শক্তির অন্তরালেতে চৈতন্য রয়েছে। চৈতন্য আছে এটাকে ভগবৎ-সত্তাই বলো, আর আত্ম-সত্তাই বলো, যে নাম দিয়েই বলো, একটা কেউ আছে—আমি আমাদের ভাষায় বলবো সেটা হচ্ছে প্রথম পুরুষ। আছে—তাঁকে তুমি বলা যায় না। তুমি কোন্ সময় বল? ব্যাকরণ কৌমুদীর ব্যাকরণটা করে দেখো, নর, নরৌ, নরাঃ, কিন্তু সম্বোধনে—'হে নর'। যে চেতন নয়, তাঁকে ডাকা যায় কি? যখন চৈতন্য বলে জিনিসটা বুঝতে পারছো, তখন চৈতন্যকে address করবে তো? কিন্তু কি বলে? তারপর সে চৈতন্যের নাম দিলাম—তখন তাকে second person এতে নিয়ে আসলাম। second person মানে? যখন আমি বুঝবো যে, চৈতন্যের অভিব্যক্তির সাড়া পাচ্ছি। সেই চৈতন্যকে নিকটে আনবার জন্য কি করবো? অর্থাৎ যখন 'চৈতন্য' পেয়েছে এবং তারপর 'বোধন' হয়েছে—এই যে দুর্গাপূজা করে, 'বোধন' করে—'বোধন'টার মানে কি? 'বোধন' করা মানে জেগে উঠল সে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেবে। 'বোধন' না করলে কি তাকে address করা যায়? যতক্ষণ

পর্যন্ত 'বোধন' না হয়েছে, ততক্ষণ 'তুমি' বলা যায় কখনও? 'তুমি' বলতে গেলেই বুঝতে হবে যে, 'বোধন' তার হয়েছে এবং সে আমার দিকেতে তাকিয়েছে। যখন তুমি 'বোধন' করবে তখন কি হবে? তার তোমার দিকেতে মুখ হবে। একেই ইংরেজিতে address বলে। ধর, আমার ভাই আছে—নাম তার রাম। পঞ্চাশজনের মধ্যে আমি রাম বলে ডাকলে সে আমার দিকে attention দিলো। তাই যতক্ষণ 'বোধন' না হয় সেই যে বিরাট চৈতন্য তার সঙ্গে তোমার কি ব্যাপার হয়? 'বোধন' হলে কি হলো? সে জেগে উঠলো—জেগে উঠলো শুধু নয়। কি হলো? তাঁর attention is directed towards me। জড় পদার্থে তো 'বোধন' হয় না। চেতন হয়েছে সে, তার যে attentionটা আমার দিকেতে আসল। 'সম্বোধন'-এর নাম 'বোধন'। পুজো করে, উপাসনা করে। 'বোধন' না করে উপাসনা হয় না। 'বোধন' হোলে কি হলো? সেই যে চেতন বস্তুটি তার attentionটা directed হোলো towards me। সেইটে হোলো মধ্যমপুরুষ। প্রথমে আমি যে বললাম সেটা হোলো প্রথমপুরুষ—একটা চৈতন্য সত্তা আছে। তারপরে সে চৈতন্য সত্তাকে লক্ষ্য করে কথাবার্তা বলা যায়। 'বোধন' হোলো। 'বোধন' না হ'লে কিছুই হয় না। যে আছে, সে আছে। 'বোধন' হলেই তার attentionটা আমার দিকে এসে গেল। এইটে হোলো মধ্যমপুরুষ। তার পরেতে কি হবে? পরে দেখবে যাকে আমি তুমি বলছি—সেটা আমি। উত্তমপুরুষ—পুরুষোত্তম। এইটা হলো ক্রম। উত্তমপুরুষে আসলে আর দ্বিতীয় থাকে না কেউ—সেখানে তুমি থাকে না, সেও থাকে না। প্রথমে 'তৎ' হয়, তারপরে 'ত্বম্' হয়, তারপরে 'অহং' হয়। এই 'অহং'টা যখন বিরাট হয়ে যাবে, তখন সকলকে cover করবে। প্রথমে যে 'অহং'টা থাকে, সেটা থাকে সীমাবদ্ধ। তারপর সকলকে cover করে। তখন 'অহং' বললে সকলকে বোঝাবে, বুঝতে পারছো? 'অহং' মানে representative 'অহং'। তখন আমি যদি কিছু পাই সে জিনিসটা সকলের জন্য। আমি তুমি সবটাকে নিয়ে তো আমি। খণ্ড আমি তো আলাদা জিনিস। ভারি চমৎকার জিনিস! এখানেই বিশ্বকল্যাণ—বিশ্বকল্যাণ হয় কি ক'রে? সকলের সঙ্গে তোমার যদি একাত্মতা না থাকে, তাহলে কি করে বিশ্বকল্যাণ হবে? একজন যে ভিখারী, একজন যে কুলি সেও তো সেই। জগতের হিতের জন্য সেও সেটা পাওয়ার অধিকারী। এই হচ্ছে আসল কথা। কাজেই ক্রম হচ্ছে প্রথমে

third person, তারপরে second person, second person-এর পরে first person। তারপরে হবে impersonal। তারপরে পরা অবস্থা। উত্তমপুরুষের পরে পরা অবস্থা। উত্তমপুরুষ পর্যন্ত তোমার সব পাওয়া, তারপরেতে তার অতীত। সেটা ছেড়ে দাও।

তাহলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করলে তুমি third person পাচ্ছো। তারপরে 'বোধন' হবে। 'বোধন' করলে উন্মুখ হলো তোমার দিকে। তারপর উত্তমপুরুষ।

একেবারে সকলের নীচে matter এর স্থূলতম অবস্থা। সেই অবস্থা থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিকাশ হচ্ছে। বিকাশের স্তর আছে। সে স্তর কি রকম বল দেখি? বিশেষ করে আমাদের প্রাচীন মীমাংসকরা রায় দিয়েছেন প্রথমে হল প্রাণ। প্রাণের উপরে প্রথমে কি মেঘ পাওয়া যাবে? যাবে না। প্রথমে মেঘের ভিতরে কি দেখেছিলেন? মেঘটা হল প্রাণ। প্রাণের পূর্বে কি পেয়েছ? জড়বস্তু—inorganic matter। সেই inorganic matter এর অনেক স্তর আছে। সেই সমস্ত স্তরগুলো যেখানে গিয়ে শেষ হ'ল সেইখানেতে প্রথম বিকাশটা কিসের? প্রাণের। প্রাণের অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। সেই প্রাণের বিকাশটা শেষ হ'ল। তারপর বিকাশটা কিসের হ'ল? মনের। প্রাণটাই মনরূপে পরিণত হ'লো, বুঝতে পারলে? তাহলে inorganic-টাই প্রাণে পরিণত হ'ল—প্রাণটা পরে মনে পরিণত হ'ল। মনটার বিকাশ হবে। মনটার যে বিকাশ হ'ল প্রথমে—এখন কিন্তু মানুষ নয় আমরা যাকে মানুষ বলি সে জিনিসটা এখনও আসেনি। প্রাণই পরিণত হ'য়ে মন হ'ল। প্রাণের অবস্থায় কি পেলাম জগতে ঃ প্রাণী অর্থাৎ animal তার অনেক sub-divison আছে—যেমন আকাশে সঞ্চরণ করে, জলে সঞ্চরণ করে ইত্যাদি এই সব divison পেয়েছি। ঐসবগুলো প্রাণময় কিন্তু কোনটার মধ্যেই মন নাই। প্রাণের বিকাশ হয়েছে অনেক। কিন্তু তখনও মন নাই। তার পরে আসল মন। মনের যখন বিকাশ হ'ল, তখন থেকে মানুষ আরম্ভ হ'ল। প্রথমে rudimentary man। প্রথম মনের বিকাশ হলো। এখন থেকে বিশেষ নতুনত্ব একটা কিছু আছে—সেটা কি? মনের যেখানে বিকাশ হ'ল সেখানে এসে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে—সে বৈশিষ্ট্যটা কি? প্রাণটা যখন প্রথমে মনে conversion হ'ল—প্রাণ থাকল, তার পরে মনও আসল—এর আগে প্রাণ ছিল, মন ছিল না—তারপর মনও আসল যখন—প্রাণটাই মনরূপে ফুটতে লাগল, একটা higher development হ'ল—সেই মনের বিকাশেতে কি পাচ্ছি? তার বৈশিষ্ট্যটা কি? এখন 'আমি' বলে

কথা বলবার অধিকার আসল—এখন বুঝতে পারবে ভগবানের একজন সাথী হবার মত লোক তৈয়ারী হবে—মন আসার জন্য সেটা হবে। কিন্তু মন এখনও পরিষ্কার হয়নি। মনের বিকাশের মধ্যে পরপর অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো কি? প্রথমে মনের অবস্থাটা কি থাকে? তার পরে মনের অবস্থাটা কি হয়? মনের বিকাশেতে পর পর কি রকম অবস্থাগুলো হয়, সংক্ষেপে বল। মনোময় কোষের বিকাশে পরপর কি পাচ্ছি? (আমি উত্তরে বল্লাম, অহংকারটা আসছে) অহংকার আসুক সেটা ঠিক কথা (আমি আবার বল্লাম, তার চিন্তাশক্তি এসেছে। তার discriminate করার ক্ষমতা এসেছে) বাবা উত্তরে বললেন, আমি সেদিক দিয়ে যাচ্ছি না। এই বিশ্বের ওপরে যে কর্তা আছে, সেই কর্তার সঙ্গে touch-এ আসবার জন্য যে একটা অধিকার তার প্রথম সূত্রপাত হ'ল মনে। সেইজন্য আমরা বলি, মন না আসা পর্যন্ত কর্ম হয় না। কর্ম আসলো। মনের development হবে। মনের প্রথম stageতে কর্ম পাওয়া যায় না। সে automaton এর মতে চলে, তখনও কর্ম নাই। কর্ম বলে যে বস্তুটা বলে সেটা নাই। Continuous activity হতে থাকে তাকে কর্ম বলা যায় না। তার পরেতে যাকে কর্ম বলা যায়, সে জিনিসটার development হয়। তারপরেতে আসে বিচার শক্তি—এটা ভাল কি মন্দ—এটা ছোট কি বড়—করব কি করব না ইত্যাদি। এই যে discrimination এটা যতক্ষণ পর্যন্ত মনের বিকাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা আসে না। কর্মের যে বিকাশ সেটা না হলে প্রকৃতির higher evolution হয় না। কর্ম আসলে কর্মফল এসে গেল। কর্ম হলেই কর্মফল। তাহলে যা কিছু প্রাপ্তি হয় কর্মের থেকে, কর্মফল হয়। এটা পূর্বে ছিল না। কর্ম করার পরেতে কি জিনিসটা বিশেষ আসলো? Develop করে কোন জিনিসটা ক্রমশঃ? সেটা হচ্ছে ego sense, তার পূর্বেও সেটা ছিল কিন্তু কর্ম আসার পরেতে সেটা বিশেষ করে develop করে। Ego আসলেই non-ego হল—আমি-তুমি বলে একটা সম্বন্ধ হ'ল—আপন পর বলে জিনিস আসলো। এর পূর্বে আপন-পর বলে কোন জিনিস ছিল না। এখন ভগবানের সঙ্গে relation এর প্রশ্ন solve করতে হবে—মানুষের সঙ্গে মানুষের relation আসলো—এখন societyর প্রশ্ন আসলো। পশুপক্ষীর মধ্যেও তো society আছে—একসঙ্গে থাকে এক সঙ্গে কত কি হয়। সেই রকম ভাবে মানুষের মধ্যে যখন হয়, তখন একটা higher levelএ এসে যায়—অহংভাবের পূর্বাভাষ আসে। এই যে অহংভাবটা আসলো—এটা ক্রমশঃ develop করে—অহং ভাবটা যখন বেশী develop হতে লাগল—এর আগেকার যে ধারাটা সেই

ধারার মধ্যে কি change আসলো ? কি factor নতুন আসলো ? এখন যেটা হয় সেটা মানুষ ইচ্ছাপূর্বক করতে পারে, ঠিক হয় কি ঠিক হয় না সে আলাদা ব্যাপার। Differenceটা কি হলো ? একটা bifurcation হয়ে গেল এখানে—যেমন একটা শিশু—যখন শিশু থাকে তখন মায়ের under-এ আছে। যেই একটু বড় হতে লাগল তখন মা থেকে একটু আলাগা হতে লাগল, তার ইচ্ছাটা প্রবল হতে লাগল—এই রকম সেটা। এতদিন পর্যন্ত প্রকৃতিই ছিল প্রধান—প্রকৃতির চালনাতে চলতো। আর এখন হয় নিজের ইচ্ছেতে চলা। হয় আমি এটা করব আর ওখানে inner প্রকৃতি যা পায় তার থেকে হয়ে যায়। আর এখন হয় বিচার করে—এটা উচিত, এটা অনুচিত, এটা ভাল, এটা মন্দ whether it is right or wrong judgement that does not matter। এটার পূর্বে এসব কিছু ছিলই না—কর্মের দিক এখন আসলো—পাপপুণ্য বলে জিনিসটা এখন আসলো—এর পূর্বে পাপ-পুণ্য নাই—একটা পশু একটা পশুকে মারছে সেখানে পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন উঠে না। Higher level-এ উঠলে পাপপুণ্যের প্রশ্ন উঠে। Evolve করছে—evolution হচ্ছে—এই কর্মতত্ত্বের সৃষ্টি হল। প্রকৃতি রাজ্যে যে ধাক্কা দিয়ে চলছে—কয়টা principle ? প্রকৃতিরাজ্যের প্রথম দিক একেবারে জড় প্রকৃতি থেকে আরম্ভ করে নিয়ে কি পাচ্ছি ? প্রথমে যেটা হয় spontaneously—সেখানেতে কর্ম বলে জিনিস নাই—তারপর কর্ম এসে পড়ে। এবং তার ফল এসে পড়ে।

সোসাইটি এসে পড়ল, কর্ম করলেই social-life এসে গেল। যেখানে কর্মই ছিল না সেখানে social-life-এর question নাই। ক্রমশই evolve করছে, evolution-এ জিনিসটা চলে। কর্ম যতক্ষণ না আসে এবং এবং কর্ম যতক্ষণ শুরু না হয় ততক্ষণ ভগবানকে পাওয়ার রাস্তা আরম্ভ হয় না, লক্ষ কোটি বছরেও হয় না। কর্ম আসলে বুঝা যায় এমন একটা জিনিস আছে, সেই জিনিসটাকে পেতে হবে। Man হয়ে গেলে—man-এর perfection-এ ভিন্ন stages আছে। Man হয়ে গেলে কর্ম বলো, discretion বলো—সে জিনিসগুলো তখন এসে গেল। Social-life এসে গেল, ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এসে গেল। তখন উর্ধ্বমুখে উঠবার প্রচেষ্টা এসে গেল। কর্ম না আসা পর্যন্ত এসব থাকে না। কর্ম এসে গেলে যত উপরে উঠতে চাইবে দেখবে দুটো রাস্তা আছে—এই যে দুটো রাস্তা, এর মধ্যে central principle আছে। Central principle হচ্ছে কর্মের বিকাশের দিক দিয়ে ; আর একটা central principle হচ্ছে কর্মটাকে বাদ

দিয়ে প্রকৃতির evolution-এর ভেতর দিয়ে চলে যায়। মহাপুরুষরা প্রকৃতির লাইনটা ধরেই নেয় (একদিন দিনের বেলায় মনে কোরো এ সম্বন্ধে বলবো) অপূর্ব একেবারে! সেখানে কর্ম নাই—প্রকৃতির ভেতর দিয়ে। যাই হোক এখন একটা বড় জিনিস এসেছে সেটা ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছে—সেই বড় জিনিসটাকে ঈশ্বর বলো, না বলো, আসে যায় না—একটা বড় জিনিস—আনন্দের জিনিস সেটা পাওয়ার জন্যে ইচ্ছা হল—তাহলে সেটা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হয়—চেষ্টা করলে ভবিষ্যৎ-এ সেটা পাওয়া যায়। এই ভাবনাচিন্তাটা তো মনুষ্যের মধ্যে আছে। পশুপক্ষীর মধ্যে ঐ চিন্তাটা থাকে না। কাজেই এই ভবিষ্যৎ চিন্তাটা আসে যখন কর্মের প্রশ্নটা আসে। তার পূর্বে হচ্ছে সব intuitive—যে যা করে, না করে। ভালই বল মন্দই বল সেটা nature-এর থেকে হয়। আপনা-আপনি সে অবস্থাটা হয়। এই অবস্থার ভেতরে দুটি ধারা—কর্মের origin যে আরম্ভ হয়ে গেল তারপরেতে—একটা কর্মের রাস্তা ক্রমশ উৎকর্ষের দিকে যায়। আর একটা রাস্তা আছে সেটা কর্মের নয়, ঐ প্রাচীন যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতিরই সেটা। রাস্তাটা খুলে দেওয়া হল—মহাপুরুষরা তাঁরা বললেন যে আগেকার যে রাস্তাটা সেটা যদি তুমি খুলে দাও তাহলে কর্মের অনন্ত কোটি পাওয়ায় যে উন্নতি হয় তার থেকেও বড় জিনিস পাওয়া যাবে, চিন্তাগুলোর ফলে বড় বড় জিনিস পেয়ে যাবে সবাই—সেটা স্বভাবের। বড় জিনিস কর্মের থেকে আসেনা—তাঁরা বলেন কর্মের থেকে বড় জিনিস পাওয়া যায় না। লক্ষ জন্মেও সেটা হয় না—কর্মের দ্বারা সেটা পাওয়া যায় না। তাহলে এটা কে করে? করে প্রকৃতি, nature থেকেই হবে সেটা। যদি বল আগে যে nature ছিল সেই nature থেকেই হবে সেটা। আর একটা হচ্ছে কর্ম আরম্ভ হয়ে গেলে egoটা বেড়ে গেল—কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় কর্মের ফলরূপে। এই দুটো ধারা। এই দুটি ভারী চমৎকার। প্রকৃত মহাপুরুষ যাঁরা তাঁরা এই ভেতরের পথটা ধরে চলেন আর যাঁরা অতবড় নন তাঁরা কর্মের পথটা ধরে চলেন, বুঝতে পারলে? এটা পরে ভালো করে বলব। যেটা কর্মের পথ দিয়ে যায় সেটা যাবে বাইরের দিকেতে, বুঝতে পারছ? সৎকর্ম, সাধুকর্ম সে সমস্ত তুমি করবে। সেটা ধরে তুমি চলবে—সেটা যেমন একটা রাস্তা রয়েছে—সর্ব ধর্মেতেই সেটা রয়েছে—ত্যাগ করবে, সংযম করবে। সবকিছু করবে সর্ব ধর্মের মধ্যেই আছে সেটা। এটা উচিত, এটা অনুচিত, moral life এই সব একটা দিক রয়ে গেল—আর

একটা দিক হল ভেতরে যে inner nature তোমার আছে সেটাকে লাগিয়ে দাও—যে natureটা নীচে ছিল সেই সেই nature-এরই higher ধারা আছে সেটা খুলে যায়। সেই nature দিয়েই আপনাতে আপনি হবে—আপনা-আপনি সেটা হবে—সেটাতেই তুমি supermind-এর রাস্তায় যেতে পারবে—অন্যটায় সে রাস্তার যেতে পারবে না। অনেক কথা আছে কাল বলব সেটা। ভারী বিচিত্র সব ব্যাপার। কর্মের ধারায় প্রাণের বিকাশ হবে—মনের বিকাশ হবে—বুদ্ধির বিকাশ হবে—বিজ্ঞানময় কোষ হবে—আনন্দময় কোষ হবে—তারপর সেখানে গিয়ে ব্যস হয়ে যাবে, আনন্দের মধ্যে ডুবে গেল। আর অন্য ধারাতে সেটা হয় না—inner divine nature-টা রয়েছে সেইটাই জেগে যায় তখন—এ প্রকৃতির স্বভাব। পশুর প্রকৃতিও যেমন প্রকৃতি, এটাও তেমনি প্রকৃতি। আমার মধ্যে এমন একটা প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতি জেগে উঠলে তখন মানুষ একেবারে পূর্ণশক্তি সম্পন্ন দেবতা হয়ে যায়—কর্মের দ্বারা নয়, সাধনার দ্বারা নয়, কোন কিছু নয়। সেটাও তো একটা দিক রয়েছে। সেটা হচ্ছে কর্মাতীত—বিশ্বাতীত দিক। এই দুটো দিক না বুঝলে moral life-এর higher life-এর রহস্যটা ধরতে পারা যায় না।

প্রশ্ন ঃ কর্ম দিয়ে maximum কোন পর্যন্ত পাওয়া যায় ?

উত্তর ঃ কর্ম দিয়ে কর্মফল পেতে পার—কর্মের যেটা ফল সেটা তুমি পেতে পারো। কিন্তু স্বভাব প্রাপ্তি হবে না। কর্মের দ্বারা কর্মফল পাবে, তুমি স্বর্গে যেতে পার—স্বর্গের বিভিন্ন স্তর আছে সেখানে যেতে পার, কিন্তু স্বভাবে যে স্থিতি যেটা, সেটা পেতে পার না। সেটা কর্মে হয় না—সেটা কর্ম ত্যাগ করে ঊর্ধ্বগতি ধরলে সেটা হয়। সমস্ত ছেড়ে দিতে হয়—ছেড়ে না দিলে হয় না—only নির্ভর কর।

ভিতরে যে current আছে সেই current-এর tendency-ই হচ্ছে সেখানে নিয়ে যাওয়া। সেই current-ই খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আবার সেই current-ই highest অবস্থায় নিয়ে যাবে। সেটা আসে surrender-এ—সেখানে কিছু করতে হবে না। একেবারে surrender করতে হবে। আগেরটায় কর্মের স্থান আছে, পরেরটায় কিছুই করবার নাই—নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে। তোমাকে একটা গল্প বলি। স্কুলে পড়ার সময় একদিন একটা অঙ্ক কষতে কষতে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না—একটা কঠিন problem—ঘণ্টা ২ ঘণ্টা চেষ্টা করছি। তারপর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর ঘুম থেকে উঠে আবার অঙ্কটা কষবার চেষ্টা করলাম। তখন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অঙ্কটা কষা হয়ে গেল। এটা আসে

কোথা থেকে ? যে জিনিসটা দেখা যায় ভারী কঠিন আবার সেই জিনিসটাই দেখা যায় মোটেই কঠিন নয়, প্রকৃতি তখন খুলে দেয়—[কর্মের দ্বারা কর্মফল প্রাপ্তি হবে, কিন্তু স্বভাব প্রাপ্তি হবে না।]

—Inner প্রকৃতি যেটা সেটা খুলে যায় তখন স্বাভাবিক হয়ে যায়—আর যখন তা না হয় তখন সেটা কঠিন হয়। এজন্য মহাপুরুষরা ভাল কাজ কর এটা তাঁরা বলেন না, বলেন এমনভাবে চলো যার ফলে তোমার ভিতরের যে ভাল জিনিসটা আছে সেটা আপনা থেকে ফুটে উঠুক ! আপনা আপনি ফুটে উঠুক। ভাল কাজ কর সেটা তো নকল করা। অবশ্য প্রথমে আরম্ভ করতে হয় তাই দিয়ে। তারপর এমন পথ দিয়ে নিয়ে যান যার ফলে সব জিনিসটা আপনা আপনি ফুটে। ইচ্ছে করে ভাল করতে হয় না—ভাল হয়ে যায়। ইচ্ছা তোমায় করতে হবে না—সেটা ভালো জিনিস নয় ? সেটাও তোমার মধ্যে আছে। Super life—Supermind এর যে basic principle সেটাই তো কথা। সেটা encouraged হচ্ছে না তো।

জাগ্রত অবস্থায় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এগুলো গ্রহণ হচ্ছে তার। জাগ্রত অবস্থায় স্থূল দেহের অভিমান নিয়ে রয়েছে। তারপরেতে অভিমানটা কেটে গেল। তারপরেতে স্বপ্নেতে জাগ্রতের জিনিসটা থাকে না। তারপর সেটাও ডুবে যায়। তারপরে হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করে—তাকে বলে পুরীতৎ। পুরীততে গিয়ে—পুরুষ মানেই হচ্ছে 'পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ' —সেটা হচ্ছে অবিদ্যার জায়গা। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন-যোনি-প্রযত্নের উদয় না হয় ততক্ষণ সেই ঘুমটা থাকে। তারপরে ঘুম ভেঙ্গে গেলে আবার জাগ্রত। বক্রগতি এটাকে বলে। সোজা গতি না। আর এখন এক সোজা রাস্তা, বরাবর সোজা রাস্তায় চলবে। সোজা রাস্তাটা কোথায় পাওয়া গেল ? যতক্ষণ তোমার দেহাভিমান ছিল তখন তুমি সোজা রাস্তা পাও নাই। দেহাভিমান যতক্ষণ ছিল তখন তোমার ছিল জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। সরলমার্গ যেটা এটা হ'ল তুরীয় মার্গ। এটা তুরীয়ের পথ বলে। তুরীয়াতীতে যেতে হবে, কেবল তুরীয়তে হবে না। শেষ জায়গায় যখন যাবে তখন সরল পথও থাকে না। সরল পথ থাকলে তোমার শেষ হবে না। সরল পথটা ভাল করে বুঝ। এই রকমভাবে তোমার সরল পথে প্রবেশ হ'ল। সরল পথে যখন প্রবেশ হবে তখন তুমি কি অবস্থায় রয়েছ ? গতিটা কি প্রকার ? তোমার এখন যে গতিগুলো রয়েছে তাতে কি পাচ্ছ সেটা ? তিনটে অবস্থা রয়েছে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই অবস্থা। শব্দ উচ্চারণ কর যখন তখন অ, আ,

ই, ঈ দীর্ঘ কর, প্লুত কর। এই জিনিসগুলো তোমার আছে কিনা সেটা। হ্রস্ব যেটা তার থেকেও যদি কমে যেতে হয়: বক্রগতির মধ্যে যতক্ষণ রয়েছ ততক্ষণ হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, কিন্তু তোমায় যেতে হবে অর্ধমাত্রাতে। এখন ব্যঞ্জনটা উচ্চারণ করা যায় না। আগে স্বরবর্ণ দিয়ে কিংবা পরে স্বরবর্ণ দিয়ে তুমি উচ্চারণ কর। একটা হসন্ত ক্ তার ডাইনে একটা অ দিয়ে দাও, ক হয়ে গেল। বাঁয়ে দাও অক্ হয়ে গেল। এই রকম ভাবে হয় কিন্তু শুধু সেটা উচ্চারণ করতে পার না। এই যে জিনিসটা এইটে অর্ধমাত্রা এইটিকে ধরতে হবে এখন। ঐটা না ধরলে সরল পথ পাওয়া যায় না। আর যতক্ষণ তুমি বক্র অবস্থায় ছিলে ততক্ষণ হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এগুলো সব ছিল।। এখন তোমার সেই সরল পথ বুঝতে পারছ ? এই সরল পথ অর্ধ-মাত্রা থেকে আরম্ভ হল। এইটাকে বিন্দুরাজ্য বলে। শুনেছ তো বিন্দু আছে, নাদ আছে, নাদান্ত আছে। এ সব স্তর রয়েছে। বিন্দুতে আরম্ভ হ'ল সেটা। সরল পথ আরম্ভ হ'ল—অর্ধমাত্রার পথ। এই যে অর্ধমাত্রা —তুমি প্রথমে যে অর্ধমাত্রা পেলে সেই অর্ধমাত্রাতে একটা স্তর তোমার খুলে গেল। সেই স্তরেতে সমস্ত বিশ্ব তোমার কাছে প্রকাশ। কিন্তু বিশ্বের ভিতরে প্রবেশ নাই। তার ভিতরে রোধিনী শক্তি রয়েছে, নিরোধিকা শক্তি রয়েছে। বিশ্ব ভেদ করে যেতে দেয় না। এখন গুরুকৃপা বা ভগবতীর কৃপা যদি পেয়ে যাও—পেয়ে গেলে রোধিনীশক্তি ভেদ হয়ে গেল—ভিতরে প্রবেশ হ'ল। ভিতরে প্রবেশ হলে নাদে প্রবেশ হ'ল। নাদ কোথায় হ'ল তোমার ? অর্ধমাত্রার অর্ধমাত্রা হ'ল নাদ। তাহলে 1/4th হয়ে গেল। ক্রমশঃ মাত্রা কমে যাচ্ছে। এইভাবে নাদের পরে নাদান্ত হবে। নাদান্তের পরেতে তুমি দেহের বাইরে চলে যাবে। নাদান্ত হচ্ছে দেহের একেবারে ঊর্ধ্বেতে। নাদান্তের পরাবস্থা যেটা সেটা দেহের বাইরে। পিণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ড আর কি ! পিণ্ড থেকে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ হ'ল তখন। পিণ্ড থেকে ব্রহ্মাণ্ডে এলে অর্ধমাত্রা ধরে। ক্যামেরা যেমন—ক্যামেরাতে exposure দেয়, instantaneous exposure দেয় জান তো ? একটা ভাল ক্যামেরা দিয়ে 1000 পর্যন্ত অথবা তারও পরে exposure দেওয়া যায়—তার মানেই হচ্ছে exposureটা কমে যাচ্ছে instantaneous exposureটাও ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। অর্ধমাত্রার পরে অর্ধমাত্রা হ'ল। তারপরে আবার তার অর্ধমাত্রা হ'ল। এই যে অর্ধমাত্রা ধরে ধরে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ ; এই যে সিঁড়ি, যেমনতর ধর পা ফেলছ আবার পা তুলছ, সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে নামছ বটে কিন্তু on the whole উপরে উঠে যাচ্ছ। সিঁড়িতে উঠবার মত পা ফেলে চলবার মতন।

একপা উঠাচ্ছি আবার ফেলছি—আবার উঠাচ্ছি আবার ফেলছি। On the whole এগিয়ে যাচ্ছি। এইখানেও ঠিক তাই। অর্ধমাত্রার পরে অর্ধমাত্রা এই ভাবে ক্রমশঃ যাচ্ছে। এই রকম ভাবে ক্রমশঃ যেতে যেতে কি হচ্ছে তাতে? এইটা হ'ল যোগমায়ার রাজ্য। মায়া রাজ্য হ'ল কোনটা? না যখন অর্ধমাত্রাতে প্রবেশ করলাম, অর্ধমাত্রায় প্রবেশ করার পূর্ব অবস্থা হচ্ছে মায়িক রাজ্য। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি হচ্ছে মায়ার রাজ্য। এখানে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি নাই। কিন্তু পূর্ণ অবস্থা এটা নয়। পূর্ণাবস্থায় প্রবেশ হয় নাই এখনও। পূর্ণ অবস্থা এখনও বহুদূর। যোগ-মায়ার রাজ্যে যেতে হবে। তাহলেই এই যে বক্রগতি, এই বক্রগতি থেকে সরল গতি ধরতে হবে। সরল গতির পরেতে গতি থাকবে না। তোমার নিজের কিছুই থাকবে না। তখন আর একজনে তোমাকে নিয়ে যাবে সেইটেই হচ্ছে মহাকরুণা, কৃপা। সে অনেক দূরের জিনিস এখনও। কাজেই কি হ'ল তোমার—না ক্রমশঃ ক্রমশঃ যতই উপরে যাচ্ছ, এতো যোগমায়ার রাজ্য —যখন উপরে যাচ্ছ তখন কি হচ্ছে? তখন time & space ক্রমশঃই সূক্ষ্মতে এসে যাচ্ছে। এখন যে দেশকালে রয়েছে ওখানেতে সে দেশকাল নাই। অথচ দেশকাল আছে। তার উপরে উঠবে যখন আরও সূক্ষ্ম, সেখানেও দেশকাল আছে কিন্তু আগেকারটা নয়। তাহলে এই রকম দেশ-কালের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তোমার সমস্ত personalityটা transfigura-tion হয়ে যাচ্ছে—transformed হয়ে যাচ্ছে, ক্রমশঃ উপরে উপরেই উঠে যাচ্ছে কিন্তু divine হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? না গতি তো রয়েছে সেখানেতে। গতিশূন্য হ'ল কোথায়? নিষ্কল হ'ল কোথায়? এখনও তো কলার খেলা রয়েছে। এই রকম করতে করতে হয় কি, না ক্রমশঃ উপরে উঠে উঠে এমন একটা জায়গায় যাওয়া যায় যে জায়গায় গিয়ে আর অর্ধমাত্রার অর্ধমাত্রা করা যায় না—। মানুষের ক্ষমতায় কুলায় না। এখন পর্যন্ত সাধকরা, যত বড় বড় যোগী রয়েছেন highest পর্যন্ত যা পারে—সাধারণতঃ তান্ত্রিকরা (অনেক বড় ২ যোগীরা) 512, 1/512—one divided by 2, তারপর 1 divided by 4, তারপর 1/16 এই রকম ভাবে চলে যাচ্ছে ক্রমশঃ। এইভাবে যেতে যেতে 1/512 পর্যন্ত হ'ল। এর পরেতে আর পারা যায় না। তার মানেই হ'ল ক্রমশঃ মনকে সূক্ষ্ম করে যাচ্ছ—সবটার মানেই হচ্ছে মনকে কি করতে হবে, না সম্পূর্ণরূপে জয় করতে হবে। মনকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আয়ত্ত করছো। আয়ত্ত করতে করতে এক জায়গায় গিয়ে আর পারছ না। সেখানে ছেড়ে দেবে সেটাকে—এতই কম সেটা। সেটাকে count

করার মত নয়। সেই হ'ল সকল মার্গের top. বুঝতে পারছ? সেই যে জায়গাটা সেখানে কি আছে? যাকে আমাদের সর্বশাস্ত্রেতে বলে trinity—সেই শিব-শক্তি বিন্দু, ঐ যে reflectionটা পেয়েছিলে কোথায়? সেই সরোবরেতে—সেই reflectionটা যাঁর সেই জিনিসটা সেখানে পাবে। সরল পথের down-এতে সরোবরেতে সেই reflectionটা পেয়েছ। সেই সরোবর থেকে reflectionটা ধরে ক্রমশঃ উঠছো তুমি অর্ধমাত্রাকে অবলম্বন করে। অর্ধমাত্রা না হলে তুমি যেতেই পারবে না। এই অর্ধমাত্রার কথা চণ্ডীতে পেয়েছ। লোকে তো বুঝতে পারে না সেটা। সেই অর্ধমাত্রাকে ধরে ক্রমশঃ উপরে উঠবে—তারপর উঠতে উঠতে এমন একটা অবস্থায় আসবে যে তারপরেতে আর পারা যায় না। Possibie যতটা—যতটা record আছে সেটা হচ্ছে one divided by 512, i.e. 1/512। তখনও মন থাকে কিন্তু পারা যায় না অন্য বাকীটুকু reject করে দিতে হয়। এই যে reject করে দিতে হয় তাহলেও রইল সেটা।—অমনস্ক অবস্থা তো নয়—মনের বাইরে তো যেতে পারলে না। একেবারে topএ গেলে। এই যে topএ গেলে এইখানেই হচ্ছে trinity। Unity আসছে না। Unity এখনও অনেক দূরেতে। এখনও শিব-শক্তি বিন্দু। শিব রয়েছে, শক্তি রয়েছে, বিন্দু রয়েছে। দ্বৈত অদ্বৈতের রহস্য এগুলো না বুঝলে বুঝতে পারা যায় না। বাইরের যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝার তো মূল্য নাই বিশেষ। সেখানে অর্থাৎ top-এ গিয়ে পেলে নিত্য জিনিস একটা, যেটা নাকি সহস্রদল কমলে পেয়েছিলে। সেই জিনিসটার উপরের জিনিসটা পেলে। সহস্রদল কমলে reflected image ছিল সেই সরোবরেতে—এখন সেই reflection-এর মূলটাকে পেলে—পেয়ে, ধরে একেবারে top-এ গেলে। এইখানে গিয়ে যোগমায়া শেষ হয়ে যাবে। এখানে যোগমায়ার রাজ্য রয়েছে। এই অবস্থায় গিয়ে—তারপরেতে তোমার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। দুটো পথ খুব বেশী প্রসিদ্ধ। সেই দুটোর কথা বলছি। একটা পথ হচ্ছে ঐটা যেটা rejected হয়ে গেল। তুমি চলে গেলে। তারপরেতে তখন কি হবে—তখনও কলা আছে কিন্তু। তখনও শিব-শক্তি-বিন্দু—শিবের শান্ত্যতীতকলা। শক্তি রয়েছে। শক্তির শান্তিকলা। শান্তিকলা আর শান্ত্যতীতকলা। নিষ্কলে যেতে হবে তো! নিষ্কলে না গেলে হবে না। এই যখন হয় তখন নদীর পারে খেয়াঘাটের অবস্থা হয়। ওপারে যেন যেতে পারছে না। এই হলে তখন নিজেকে surrender করে দেবে। এইখানে মন ত্যাগ হবে। আর পারছি না। অন্ত ক্রমশ ভেদ করে মনের বাইরে যাব। কিন্তু সম্পূর্ণ ভেদ করতে

পারিনি। আমার ক্ষমতা আছে এই পর্যন্ত আসার। যদি অন্য কারও আরও ক্ষমতা থাকে সে আরও দূরে যাবে। তারপর-ও এই রকম জিনিসটা পাবে, কিন্তু infinite তো পাবে না। একটুকু করে যেতে positive জিনিসটাকে যতই ছোট ক'র, তার থেকে ছোট কর, fractional হবে, fractional হলে তোমার পক্ষে প্রাপ্তি হ'ল না কিন্তু রইল তো সেটা; সেখানে theoretically তো রয়ে গেল। সত্তাটা তো রয়ে গেল। কিন্তু একেবারে সেটা ত্যাগ হওয়া চাই। ত্যাগ হ'ল কই! আর যদি একসঙ্গে ত্যাগ ক'র—একটা টাকা তোমার কাছে আমি ধার করেছি। আমি নিয়ম করলাম সেই টাকাটা ক্রমশঃ শোধ করব—ক্রমশঃ শোধ করলে কবে শোধ করবে—প্রথমে আট আনা দিলে, আট আনা বাকী থাকল, তারপর চার আনা দিলে, চার আনা বাকী থাকবে, তারপর দুই আনা দিলে, দুই আনা থাকল—তারপর এক আনা দিলে—এক আনা বাকী থাকল, এক আনার পর দুই পয়সা দিলে তারপর এক পয়সা দিলে এক পয়সা বাকী থাকলো। যতই তুমি দাও কিছু অবশিষ্ট থেকেই যাচ্ছে। সেইটে মানুষ নিজের যেমন সামর্থ্য তার চরম পর্যন্ত যায়, তারপরেতে আর তো possible নয় সেখানেতে। কিন্তু theoretically দেখাও, সেখানে কিছু থেকেই যাবে। অর্ধেক দিলে অর্ধেকটা থাকবে। এই অর্ধমাত্রার রহস্য এখানে—ভারী অদ্ভুত রহস্য। প্রথমেই তুমি একটাকা পেয়েছ, একটাকাই ফিরিয়ে দাও। তাহলে অর্ধমাত্রার দরকার হতো না, সেটা অপূর্ব ব্যাপার। ২।৪ দিন বলেছি কোন পথেরই দরকার হয় না—পূর্ণ জিনিসটা সামনেই পাওয়া যায়। ক্রম দরকারই হয় না—অক্রম মার্গ আছে। আবার সাধনার ক্রম আছে। ক্রমের ভিতরে অনেক ব্যাপার আছে। কেউ ক্লাশে promotion পায়, কেউ double promotion পায়, কেউ treble promotion পায়। এক ক্লাশে থেকে দুটো ক্লাশ ভেদ করে গেল—যোগ্যতার উপর depend করছে। Nature তো সে সবগুলো দেখে। যাই হোক সেখান থেকে গিয়ে তুমি অনন্ত মহাসমুদ্রের কূলেতে পড়ে রয়েছ—আর তো তোমার যাবার ক্ষমতা নাই—শক্তি exhausted হয়ে গেছে, সেইখানে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়—এই খেয়াঘাটের কাছে। তখন মহাকরুণার উদয় হবে সেই সময়েতে। সেইটাকে বলে উন্মনী শক্তি। একটা যেন তরী নিয়ে এসে তোমাকে পার করে দিল সেটা। পার করে দেওয়া মানেই হচ্ছে মনের বাইরে চলে যাওয়া—মনোনিবৃত্তি পরম প্রশান্তি। মনের নিবৃত্তি হয়ে গেল সেইখানে। আর মন নাই। মন নাইতো কলা আসবে কোথা থেকে? নিষ্কল অবস্থা। নিষ্কল অবস্থায় গেলে all contradic-

tions disappear করে যায়, কোন contradiction থাকে না। White আর non-white কিছুই নাই এক কথায়। আর আমাদের এখানে আছে একটা contradiction আর একটা contrary। কিন্তু সেখানে contrarya তো কথাই নাই contradictionও নাই। সেখানেতে সাকার এবং নিরাকার they mean the same—সাকার নিরাকারে কোন difference নাই। আছে কোথায়? না, কলার মধ্যে—কলা আছে যেখানে। আর যেখানে নিষ্কল সেখানে একটাই জিনিস—যেই সাকার সেই নিরাকার। তুমি সাকার চাও তো সাকার এসে পড়বে, নিরাকার চাও তো নিরাকার এসে পড়বে। যদি চাও সেখানে কিছুই না থাকুক—কিছুই নাই, মহাশূন্য। শূন্যও থাকবে না, তার অতীত অবস্থায় তুমি চলে যাবে। সেই চিৎপ্রকাশে প্রবেশ হয়ে যাবে। চিৎপ্রকাশও থাকবে না—শুধু সত্তা মাত্র, আর কিছুই নাই। সবই তোমার হাতে। উন্মনী অবস্থা সেটা—মনোনিবৃত্তি পরম প্রশান্তি—মনের বাইরে না গেলে হয় না। মনের বাইরে যাবার জন্য একটা রাস্তা। আগমবিদ্‌রা এর রহস্য জানেন, তাঁরা এর ব্যাখা করেছেন।

এর ভিতরে তুমি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাচ্ছ, তুমি ওখানেই পেতে পার শেষটা। তুমি যদি ক্লান্ত হয়ে পড় তাহলে তোমার সাধনা শেষ করবার দরকার নাই। তখনই তিনি এসে কোলে নেবেন তোমাকে। যেখানে ক্লান্ত হয়ে পড়বে সেখানেই কোলে নেবেন। গীতাতে তাই দেখিয়েছেন—প্রথমে বলেছেন "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"—এই অবস্থা রয়েছে। এইটে পর পর চলছে সেখানে। এই মায়াটা বাইরের মায়াও বটে, যোগমায়াও বটে। সেটা হয়ে গেল, তবু তোমাকে মায়ার ভিতরে থাকতে হচ্ছে। মায়ার ভিতরে থাকবেনা কোন সময়েতে? যখন নিষ্কলেতে পড়বে। সেই নিষ্কলটাকে বৈষ্ণব শরণাগতির কথা বলে—সেই রাস্তায় এসে পড়ে। শরণাগতিতে তোমার করার কিছু নাই। শুধু ত্যাগ করতে হবে। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—আগে বলেছেন এটা ক'র, এটা ক'র, এটা ক'র, এটা ক'র। এখন করতে বলছেন না—এখন ছাড়, ছাড়। তোমার কর্তৃত্বই নাই—শুধু minimum কর্তৃত্বটুকু আছে, সমস্তগুলো ত্যাগ করা। ত্যাগ করে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং-এর নাম হচ্ছে একায়নমার্গ। এই একায়নমার্গের কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন ছান্দোগ্য উপনিষদের মধ্যে—নারদ-সনৎকুমার সংবাদ, তার ভিতরেতে পাবে। সেগুলো তো সাধারণ অবস্থায় বুঝা যায় না। একায়নমার্গে যে অবস্থায় হোক্ না কেন তুমিই একমাত্র ভরসা। 'ত্বমেব শরণং

মম দীনবন্ধো'—তুমিই, দ্বিতীয় কিছুই নাই। মা ভাবতে পার, বন্ধু ভাবতে পার—সেই একমাত্র। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—শরণাগতি। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি—তোমার ভিতরে কত পাপ রয়েছে—অপহত পাপ, যাকে বলে উপনিষদে—তুমি পাপ হতে মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করেছ। তোমার চেষ্টা শেষ হয়ে গেছে। তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার আমি করব, তিনি বলেন—এই মা যেমন শিশুকে কোলে নেন। তোমার মধ্যে ময়লা মাটি আর থাকবে না। তুমি তো কর্ম ছেড়ে দিলে, আর কি করে থাকবে? তুমি কর্ম করে শোধন করেছ তবু কিছু ময়লা থেকে যায়—residue থেকে যায়। তুমি তো সম্পূর্ণ করতে পারছ না। কাজেই কলার মধ্যে থেকে নিষ্কলে যেতে পারছ কই! এবার তিনি কোলে নেবেন। কোলে নিলেই আর কিছুই না। এক moment-এর মধ্যে। এটাই মহাক্ষণ। ক্ষণকে ধরলে কালের বাইরে যাবে। এইজন্য পতঞ্জল দর্শনে বলেছে—'একমেব ক্ষণং, তস্মিন্ এব ক্ষণে সর্বং জগৎ পরিণামমনু-ভবতি'। একস্মিন্ এব ক্ষণে—কালের মধ্যে পরিণাম আছে। ক্ষণে পরিণাম কোথায়? অখন্ড প্রকাশ নিত্য বর্তমান। সেখানে সব পাবে—যা চাও সব পাবে। মায়ের কোলে গেলে আর ভয় থাকে কোন কিছুর? ভয় নাই। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি—যত রকমের পাপ আছে, মলিনতা আছে, ক্ষুদ্রতা আছে যাতে নাকি infinite-এর সঙ্গে যোগ দিতে পারে না সে সবগুলো আমি খণ্ডন করে দেব। সব যদি সরিয়ে নেন তাহলে কি থাকে? You will become divine, তুমিই তো divine হয়ে যাবে তখন সেখানেতে। স্বয়ং ভগবান ছাড়া divine করতে পারে? এইখান থেকে divine evolution আরম্ভ হয়। যখন শরণাগত হয়ে গেলে—তাঁর আশ্রয়েতে পড়ে গেলে তখন তো সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর। তিনি করেছেন। তুমি শিশু হয়ে গেছ। তোমার কিছু কর্তৃত্ব নাই, কর্ম নাই, কর্মকর্তাও নও তুমি। কর্ম নাই, কর্মফল নাই, ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই।

কিছুই নাই। কেবল তোমাকে তিনি তৈয়ারী করেছেন। কিভাবে তৈয়ারী করেছেন, অপহতপাপ্মা—তোমার ভিতরে ময়লা আছে, আবরণ আছে, সেগুলো তিনি সরিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ মা তোমার ভিতরের সব ময়লা মাটি পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। সমস্ত পরিষ্কার করে যদি দেন তখন তুমি তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাবে। এই একটা যখন complete হবে তখন divine evolution complete হবে। এখানে তোমার কাজ হচ্ছে surrender। মা তোমায় ধোয়াচ্ছেন। এখন তুমি complain করতে পারবে না। যা করবার তাঁকে

করতে হবে, তোমার কিছুই করবার নাই। You will have to submit only। Submit করতে না পারলে শরণাগত হতে পারলে না। তোমার ego এসে গেল সেখানে। তোমার egocentric complex যেটা সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত মুছে না যায় ততক্ষণ তুমি পূর্ণ হবে কি করে? পূর্ণ যখন হয়ে যাবে, তখন দেখবে সমস্ত বিশ্বের অনন্ত egoই তুমি—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তখন আপনিই ফুটে উঠবে। সব জায়গায়ই তিনি আছেন। এখন বলি মন্দিরে তিনি আছেন, বেশ্যালয়ে তিনি নাই—সবই তো তিনি। এই যে processটা যেটা, নাকি মা করেন শিশুর ধোওয়া-পাখলা—তখন যে বিকাশটা হয় সে বিকাশটা কি? সেইটা হ'ল divine evolution। প্রথমটা হচ্ছে natural evolution, তার পরেরটা হচ্ছে human level কর্ম। তারপরে semi-divine, তারপর divine। তাহলে জিনিষটা হ'ল কি? একটা অপরা প্রকৃতির (শক্তির) খেলা, একটা হচ্ছে পরাপরা শক্তির খেলা, আর একটা হচ্ছে পরাশক্তির খেলা। মাঝখানে evolution ছিল না—সেটা ছিল সংসার। তার মধ্যে কালরাজ্য রয়েছে। তাতে অনন্তকোটি জন্ম কাটিয়েছ—সমস্ত রয়েছে তার মধ্যে, এপারেতে evolution আছে, ও-পারেতে evolution আছে। মাঝখানেতে পরাপরা—বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ এই পর্যন্ত পরাপরা। পরা—পাইনি এখন পর্যন্ত অথচ অপরাটা শেষ হয়ে গেছে। অপরাটা শেষ হয়ে গেছে, মানুষ হয়েছে, কর্ম হয়েছে, কর্মফল ভোগ আছে। এখন সেই কর্মফল এবং ভোগ শেষ হয়ে গেল। তখন তুমি পরাপরাতে গেলে। তারপরেতে পরা-পরায় পেঁছে গেলেই তুমি divine হয়ে গেলে। Divine যখন হয়ে গেলে অনন্ত God হয়ে গেল সেটা। প্রত্যেকেরই different সত্তা সেটা, অথচ একই। সেখানেতে তো contradiction নাই—একই অনন্ত। সাকার ব'ল, নিরাকার ব'ল সব জিনিসই আছে। এর পরে তোমাকে নিজের থেকে বুঝতে হবে। Lecture শুনে বুঝতে পারবে না সেটা, language দিয়ে সেটা প্রকাশ করা যায় না। সেখানে সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে। Divine Possibilitiesগুলো infinite—সব সময়ই আছে। আসলে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ কোনটাই ভুল নয়। প্রত্যেকের নিজের নিজের একটা স্থান আছে। শিশুর জীবনের অনুভূতি, সেটাও যেমন সত্য, আবার যৌবনেতে যুবকের অনুভূতি যেটা সেটাও সত্য, আবার বৃদ্ধ অবস্থায় যে অনুভূতি সেটাও সত্য। তাই বলে একটা আর একটা এক রকমের তা তো নয়। অথচ ভেদের ভিতরেতে অভেদ রয়েছে। মালা যেমনতর 'সূত্রে মণিগণা ইব'। কাজেই একের মধ্যে অনন্ত গ্রথিত রয়েছে।

এই হ'ল divine evolution। Divine evolution হ'ল কিসের জন্য—না, ভগবত্তা লাভ করবার জন্য। ভগবত্তা লাভটা কিসের জন্য? বিশ্ব কল্যাণের জন্য। এইজন্য বলে 'সেবাধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ'। প্রকৃত সেবা যেটা সেটা ভগবৎ সাক্ষাৎকার পূর্ণভাবে না হলে করতে পারে না। তার পূর্বে যা কিছু করে সেটা কর্ম—ভাল কর্ম, শুভকর্ম, নিষ্কাম কর্ম—সে আলাদা কথা। আর এখন এখানে কিছুই নাই।

পরিপ্রশ্ন ঃ এই পথে নিরোধিকা শক্তিটা কোন জায়গায় আসছে?

উত্তর ঃ নিরোধিকা শক্তি আসছে বিন্দুর পরে, নাদের পূর্বে। বিন্দুটাই চিদাকাশ। চিদাকাশে প্রবেশ করার পরেই—চিদাকাশে প্রবেশ করলে বটে কিন্তু তারপরে আর ভিতরে ঢুকতে পারছ না। সিদ্ধ অবস্থা যেটা তার প্রথম অবস্থায় এটা হয়। অথচ অন্তর্জগতে প্রবেশের অধিকার হয়নি তখনও। অথচ জাগতিক অবস্থা থেকে উর্ধে আছ; এটা হচ্ছে বিন্দুর অবস্থা। অর্ধমাত্রাটা প্রথম যেখানে আরম্ভ হ'ল। নিরোধিকা শক্তি রয়েছে, তাকে কেউ বলে রোধিনী শক্তি, কেউ নিরোধিকা বলে। তাকে ভেদ করতে হয়।

(অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী) পরিপ্রশ্ন ঃ আপনি সহস্র কমলকে সহস্রারের প্রতিবিম্ব বলে বর্ণনা করেছেন, সেই জল কি? জলের স্বরূপটা জানতে চাচ্ছি।

উত্তর ঃ জলটা হচ্ছে শুদ্ধ সত্ত্ব—এই শুদ্ধ সত্ত্বটাই প্রথম শেল। যতক্ষণ ভেদ করিনি ততক্ষণ ত্রিগুণের সঙ্গে যোগ ছিল।

পরিপ্রশ্ন ঃ এই যে সহস্রদল কমল যেটা বললেন, যার প্রতিবিম্ব সহস্রদল কমলরূপে ফুটে উঠেছিল সেই সহস্রার কমলের স্বরূপটা কি?

উত্তর ঃ সহস্রদল কমল হচ্ছে Trinity। কমলের ভিতরে যে বিন্দুটি আছে—কমলে দুটো জিনিস আছে ঃ ব্রহ্মসংহিতা পড়েছ? মহাপ্রভু যেটা এনেছিলেন তাতে আছে 'সহস্রপত্রং গোকুলং......(টেপ ফুরিয়ে যাওয়ায় আর রেকর্ড করা যায়নি)।

মহাসৃষ্টি

গুরুজীর ঘর।

প্রশ্ন ঃ মাঝে মাঝে আপনার কাছে মহাসৃষ্টির কথা শুনে থাকি, অথচ মহাসৃষ্টি বলতে কি বুঝায় বুঝি না। একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ঃ সৃষ্টির আদি আছে, সৃষ্টির অন্ত আছে, আবার সৃষ্টির আদিও নাই, অন্তও নাই। অজ্ঞান, মায়া, শক্তির খেলা অনাদিকাল থেকে চলছে,

কিন্তু সে তো শেষ হয়ে যাবে। অনাদি সান্ত। যেটার স্ফুরণ হবে, তার beginning আছে, end নাই। সাদি অনন্ত। দুটো একত্র করলে সেই অনাদি অনন্ত রয়ে গেল। এসব কথাগুলো বৈদান্তিকরা বলে গেছেন—কথাগুলো তো সত্য কথা।

এই সৃষ্টিটাকে আমরা দেখি খণ্ড দৃষ্টিতে। এই সৃষ্টির background এ মহাসৃষ্টি আছে—এই conceptionটা পৃথিবীর কোনো philosophyতে নাই। Entire worldএর মধ্যে কোনোখানে নাই এই মহাসৃষ্টির কল্পনা। মহাসৃষ্টি বলে যে জিনিসটা আগমশাস্ত্রে সাধারণ তান্ত্রিকরা কিছু জানেন না তার। অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি বড় বড় তান্ত্রিকরা তাঁরা সেটা point out করেছেন। মহাসৃষ্টিতে সব জিনিস লুকানো রয়েছে, আর যোগী—শ্রেষ্ঠ যোগী যাঁরা তাঁরা সেটা utilise করেন। সেটা বুঝা দরকার। আর খণ্ড সৃষ্টি তো বুঝতেই পারা যায়। মহাসৃষ্টিটা বুঝা বড় কঠিন। অথচ সেই জিনিসটা পাওয়া যায়। মহাপুরুষ, যাঁরা নাকি প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন, তাঁরা মহাসৃষ্টির সন্ধান পেয়েছেন। সেই জিনিসটা কি? কথাটা তো বুঝতে পারলে না। মনে কর পাঁচজন সাথী নিয়ে বুদ্ধদেব ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন, কি দশজন সঙ্গে আছেন, ভিক্ষা করতে করতে এমন একটা জায়গায় গেলেন, যেখানে কোনো ভিক্ষা পাওয়া যায় না অথচ ক্ষুধা পেয়েছে। বসে গেল। যে যা চাইছে দিতে হবে সেই জিনিসটা—সব জিনিস ready made তৈরী—কোথায় পাবে সেটা? আমি উত্তরে বললাম—মহাসৃষ্টিতে। তখন বাবা বললেন মহাসৃষ্টি কথাটা বললে তো হবে না—তখন কি একটা একটা করে তৈরী করে দিচ্ছিলেন? তা না সবই সেখানে আছে। এই রকম ঘটনা অনন্ত কোটি কোটি তোমাকে দেওয়া যেতে পারে। Christianদের মধ্যে, মুসলমানদের মধ্যে, সব জায়গাতে আছে; কিন্তু interpretationটা কোনো জায়গায় পূর্ণরূপে নাই। সকলে বলে যে miraculous power আছে হয়ে যায়। এটা বুঝবার মতো, খুঁজবার মত অবস্থা কারও নাই। সেটাই মহাসৃষ্টি—সব জিনিস তৈরী আছে। খাবে এখন গরম গরম লুচি, সেটাও আছে। মা'র কাছে সে জিনিস আছে। মা কি philosophy করেন? মা সেই philosophy করেন না কিন্তু স্থিতিটা সেখানে আছে।

২00 লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিলো, ৫00 লোক এসে গেছে। তখন পরমানন্দ স্বামীজি ছিলেন না। কোন কাজে গিয়েছিলেন—সবাই ছটফট্ করছে ক্ষুধায়—বেলা হয়েছে, ক্ষুধা লেগেছে, তখন জায়গা ক'রে

বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। তখন বলা হ'লো জায়গা করে কি হবে ৫০০ লোক বসে যাবে আর ২০০ লোকের খাবার রয়েছে।—সবাইকে কি করে দেওয়া যাবে? দিতে না পারাটা তো লজ্জার কথা। বরং একটু দেরীতে খেতে বসুক। এই মনে করে ব্যবস্থাপকরা ব্যবস্থা করেছেন—আর সকলে complain করছে ক্ষুধা লেগেছে বলে—মার কানে গেছে একথা। মা এসে বললেন—জায়গা করে বসিয়ে দাও এদের, ক্ষুধা লেগে গেছে। তখন মাকে বলা হ'লো. দেবো কি করে? ৫০০ লোক এসেছে অথচ ২০০ লোকের খাবারের ব্যবস্থা আছে। তখন মা বললেন—আমি তো আছি। বসিয়ে দাও।

'আমি তো আছি'—এইটুকু এক sentenceএর মধ্যে কত বড় philosophy নিহিত আছে—সেই রকম ঘটনা Christianদের মধ্যে, অনেকের মধ্যে আছে—how to interpret it? তাঁরা সেই philosophy জানেন না, কিন্তু সেই জিনিসটা তো জানেন।- একজন গীর্জার পাদ্রীর কাছে খাবার রয়েছে দুজন কি চারজনের, আর এসে গেছে পনেরো কুড়িজন, কিন্তু সবাইকে খাবার দিয়ে দিচ্ছে, কোত্থেকে দেয়? এই রকম ঘটনা কত তুমি পাবে Christianদের বইতে। সেটা তো এখন বুঝা যায় না—শুধু বুঝা যায় যে divine power ছিল। Miracle করেছিল। Miracle বললে তো হবে না। আমার চেষ্টা মানেই তো বুঝবার চেষ্টা। কিন্তু বুদ্ধির অতীত জিনিস অথচ সত্য রয়েছে।

মহাসৃষ্টি যে বলছ তার সম্পর্কে যদি কারো ধারণা থাকে অথবা সাক্ষাৎভাবে নাও থাকে এবং যদি গুরুকৃপা থাকে তাহলে এক সেকেণ্ডে দেওয়া যায়—এক সেকেণ্ডে। কিন্তু সে জিনিসটা তো চাই। সেটা হতে পারে। সেটা যদি না হতে পারে তাহলে তখন ধরে ধরে, উপাদানকে ধরে ধরে হলেও করতে পারে সেটা। আর মহাসৃষ্টির conceptionটা যাঁর clear হয়ে গেছে ভিতর থেকে, আকর্ষণ-বিকর্ষণ যদি করতে পারে তাহলে মহাসৃষ্টির থেকে আসতে পারে। মহাসৃষ্টিতে সবই আছে তো—লক্ষ বৎসর যদি অনবরত বলে যাও তাও শেষ হবে না। সেখানেতে তুমি যা কিছু কল্পনা করবে সে জিনিসটা সত্য—সব জিনিস সেখানেতে আছে—সেটা বোঝানোর জন্য মহাসৃষ্টির theory দিয়ে বলছি। বললাম না রান্না করছে, যদি গরম গরম দুধ চাও সেও আছে—আরও একটু বেশী গরম চাই, ready আছে সেখানে—সেখানে সবই আছে।

কাজেই সেইখানে তো বলবার কিছু নাই। যা কিছু সৃষ্টির স্ফুরণেতে

উঠেছে—সবের totalityর যে totality সেটা—সমস্ত বিশ্বের।—জগৎ, তার অতীত অবস্থা সেটা—সবই আছে। সেখানে কি বুঝতে চাও? এই মহাসৃষ্টিতে যখন নাকি অধিকার হয়ে যায় তখন হয়।—সেদিন যে কথাটা মা সম্বন্ধে বললাম, সেটা তো সত্য। অথচ বিরাট পণ্ডিতকে বল, সে তো বলতে পারবে না সেটা। তাহলে কি হ'লো সেটা? এই ধর যারা কৃষ্ণলীলাতে ব্রহ্মা গোরুদের হরণ করে নিয়েছেন—এগুলো তুমি একভাবে বুঝে নেবে আর মহাসৃষ্টিটা যে বুঝতে পেরেছে মানে যে—clear conception যার হয়ে গেছে, সে মহাসৃষ্টি থেকে সব জিনিস ধরতে পারে। মহাসৃষ্টিটা বাদ দিয়ে হতে পারে—individually হতে পারে বুঝতে পারলে? দোকানেতে সব রকম জিনিস তৈরী আছে—গরম গরম চা আছে, ঠাণ্ডা চাও আছে, আরও কত রকম জিনিস আছে—আর আমি চা কিনে নিয়ে গরম করে নিতে পারি। আবার একেবারে readymade গরম চাও আমি পেতে পারি—সেই রকম মহাসৃষ্টির ব্যাপার—সেখানে সব রকমই আছে।

তোমার questionটা ঠিক কি?

আমি ঃ আমাকে বুঝিয়ে দিন মহাসৃষ্টিটা কি?

উত্তর ঃ—মহাসৃষ্টিটা হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টিটার totalityটা—সর্বপ্রথম যে স্থিতিতে ভাসে সেটা হচ্ছে মহাসৃষ্টি।

তোমাকে বোঝানোর জন্য বলছি, এমন দোকান আছে যেখানে সব পাওয়া যায়—সূঁচ পাওয়া যায়, সুতো পাওয়া যায়, সব পাওয়া যায়। আবার এমন দোকান আছে যে সূঁচ-সুতোর জন্য আলাদা দোকান, রান্নার জিনিসের জন্য আলাদা দোকান, কাপড়-চোপড়ের জন্য আলাদা দোকান—এ রকমও তো আছে।

কাজেই মহাসৃষ্টি বললে যা বোঝায় সে জিনিসটার conceptionটা আমাদের শিক্ষিত লোকদের ৯৯৯ এর মধ্যে নাই, সমস্ত তোমাকে যখন বললাম তখন সেই conceptionটা মেনে নিয়ে—এখন তো তোমার বোধে আসা দরকার তো প্রাপ্তির জন্য—আর বোধে যদি এসে যায় সে জিনিসটা তাহলে question কর। এমনি এমনি প্রশ্ন (question) করার তো মানেই নাই। একটা wordএর থেকে কোন question করবে?

একবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ নিয়ে বাবাকে (গুরুদেবকে) বলেছিলাম। তখন তিনি কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধটা কি রকম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি lensটা দিলেন এবং বললেন—একটা শিশি দাও। এবারে

বললেন—বল কি কি। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে 'হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ যে না পায় তার নাসা-ভস্ত্রার সমান। মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল'—সেটাই আমি বলে দিলাম। কি আছে? কস্তুরী আছে, আর কি আছে? নীলপদ্ম তার গন্ধ, তারপরে কি আছে, তুলসী আছে, আর কি আছে?—শ্বেতচন্দন—এই রকম কয়েকটা যা আছে আমি সব বললাম। তারপর বাবা বললেন, 'এই নাও'—শিশি ভরে গেল—নীলাভের মত একটা রঙ—এত দিব্য গন্ধ—এত সুন্দর এটা। আমি শব্দটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটা আকর্ষণ করে দিলেন। কি করে আকর্ষণ করে দিলেন? সেটা ছেড়ে দাও সেটা এখন বুঝতে পারবে না। এত সুন্দর গন্ধ যে সবাই বাজার থেকে আতর বাদ দিয়ে বাবার থেকে অঙ্গগন্ধের শিশি কিনে এনে নিজেরা নিয়ে যেতেন। তারপর আর বলতে হতো না। Direct তিনি গন্ধটা আকর্ষণ করে দিতেন। তখন আর তৈরী করতে হ'তো না। কাজেই সব জিনিস তৈরীভাবে পাওয়া যায়—আবার তৈরী করাও হয় সব জিনিসগুলো—খুচরোভাবেও পাওয়া যায় আবার একসঙ্গে সবগুলোও পাওয়া যায়। সব জিনিস আছে মহাসৃষ্টির ভেতরে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রশ্ন ঃ তান্ত্রিক সাধনায় বৌদ্ধদের অবদান কি?

উত্তর ঃ প্রাচীন বৌদ্ধ সাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা অল্পবিস্তর হইয়া থাকিলেও উহার তত্ত্ব সমীক্ষা এখনও কেহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পালিভাষায় লিখিত অভিধর্ম সাহিত্যে ও পরবর্তী বিশুদ্ধি মার্গ, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে তত্ত্ব ও সাধন সংক্রান্ত বহু মূল্যবান্ উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এখনও সাধকবর্গের উপজীব্য। মহাযান সম্প্রদায়ের সাধনার ক্ষেত্র আরও বিশাল এবং উহার অবান্তর বিভাগও অত্যন্ত বিচিত্র। মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি মার্গ ইহারই অন্তর্গত। এই সকল মার্গের সাধনা কোন না কোন অংশে শক্তি উপাসনার সহিত জড়িত বলিয়া তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গীভূত। সে যুগে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, পাশুপত, কাপাল প্রভৃতি অসংখ্য আগমমূলক সাধনধারা প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক সাধনাও সেই যুগেরই সাধনা। জৈনগণের পদ্মাবতী প্রভৃতি সাধনার মূলও প্রায় সেইযুগেরই মনে হয়।

দুঃখের বিষয় এই তান্ত্রিক সাধনার বিস্তারিত ইতিহাস এখনও রচিত হয়

নাই—সাধন রহস্যের আলোচনা ত দূরের কথা। কিন্তু ইতিহাসাদি নির্মাণের ও সম্যক্ আলোচনার আধারভূত প্রামাণিক সাহিত্য এখনও পর্য্যাপ্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তান্ত্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সাধকগণের অবদান কম নহে। ইহা সংকলন করিয়া সুরক্ষিত রাখিবার সময় আসিয়াছে। শক্তি সাধনার রহস্য উদ্ঘাটন অতি কঠিন ব্যাপার এবং ইহা সকলের পক্ষে সুসাধ্যও নহে, কিন্তু সাধনার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ও চর্য্যা বিবরণ অপেক্ষাকৃত সরল। সাধনার বহিরঙ্গ, চর্য্যা ও ক্রিয়া এবং অন্তরঙ্গ, যোগ ও জ্ঞান।

প্রাচীনকালে বৌদ্ধসমাজে মুমুক্ষু শ্রাবকগণের জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্পাদনপূর্বক পরমানন্দস্বরূপ শাশ্বতপদের অধিগম অথবা নিব্বাণলাভ। তৃষ্ণারূপ বন্ধন হইতে মুক্তিই নিব্বাণ। একমাত্র তৃষ্ণাই প্রাণিবর্গকে বিচিত্র সুখদুঃখ ভোগের জন্য, তদনুরূপ নানাদেহ গ্রহণ করিয়া জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের মধ্য দিয়া গমন করিতে বাধ্য করে। তাই ভাবচক্রস্বরূপ সংসার বন্ধনের বা যাবতীয় দুঃখের মূল কারণই তৃষ্ণা। কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক নামক লোকত্রয়ের সর্ব্বত্র বিশ্বব্যাপিভাবে তৃষ্ণার খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। কামলোকে কামতৃষ্ণা, কামবর্জিত রূপলোকে রূপতৃষ্ণা এবং কামরূপ উভয়হীন অরূপলোকে ভবতৃষ্ণা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই সমগ্র জগতেই তৃষ্ণার ফল দুঃখও আছে। প্রকৃত সুখ জগতে কোথাও নাই। যে সুখ আছে তাহা তৃষ্ণার পূর্ণতাজনিত। ইহা বৌদ্ধ পরিভাষায় "বেদয়িত সুখ"। তৃষ্ণাক্ষয় হইতে যে সুখের অভিব্যক্তি হয় তাহাই পরম সুখ বা নির্বাণ—তাহাই শান্তি। তাহা সমগ্র বিশ্বে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জাগতিক সুখ তৃষ্ণার পূর্তি হইতে হয়, দুঃখ হয় তৃষ্ণার অপূর্তিতে। সকল তৃষ্ণা পূর্ণ হয় না, যাহা হয় তাহাও সাময়িকভাবে হয়। সেইজন্য জগতে সুখের মধ্যেও দুঃখ মিশ্রিত থাকে। সুখের পূর্বেও দুঃখ, পরেও দুঃখ, মধ্যেও দুঃখ তাই বিবেকিগণ এ সুখকেও দুঃখ মধ্যেই গণনা করেন। ইহা অনাবিল নিত্য সুখ নহে, যাহাতে দুঃখের লেশমাত্র বিদ্যমান থাকিতে পারে না। প্রাচীনকালে সাংখ্যযোগেরও ইহাই শিক্ষা ছিল এবং বুদ্ধদেব স্বয়ংও ইহাতে নিষ্ণাত ছিলেন।

আসলকথা তৃষ্ণা না থাকিলেই সুখ। এই না-থাকাটা বিষয় ভোগদ্বারা তৃষ্ণার পূর্ণতা হইতেও হইতে পারে—ইহার নাম ভোগ। অথবা বিষয় ত্যাগদ্বারা তৃষ্ণার ক্ষয় হইতে পারে। ইহার নাম ত্যাগ—বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস ইহারই প্রকাশ। বুদ্ধদেব দ্বিতীয় পথকেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপুরুষমাত্রই তাই করেন। কিন্তু ত্যাগ অতি কঠিন। অনাদিকাল হইতে

চিত্তে ভোগ সংস্কার রহিয়াছে। প্রকৃত ত্যাগ অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার। চিত্ত স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও ভাস্বর হইলেও ক্লেশ, কর্ম, বিপাকাদি দ্বারা সর্বদা আবিল। তাহাকে শুদ্ধ করিতে না পারিলে যথার্থ ত্যাগ কথার কথা মাত্র।

শাক্যমুনি সংস্কার ত্যাগ করিয়া এই পরম শান্তির অন্বেষণেই বাহির হইয়াছিলেন এবং উৎকট তপস্যা দ্বারা শান্তি বা পরমানন্দের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং জীবের কল্যাণের জন্য তাহার প্রচারও করিয়াছিলেন।

সম্যক্ সংবুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ ও অর্হৎ এই পরম শান্তি লাভ করেন, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন। বুদ্ধদিগের কথা বলিব না। অর্হৎ ইহা পাইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করেন। পঞ্চস্কন্ধ মাত্র তখন থাকে, কিন্তু অন্য ক্লেশাদি থাকে না। ইহাও নির্বাণ বটে তবে পরনির্বাণ নহে। তাহা লাভ হয় যখন তখন স্কন্ধও থাকে না। তখন রাগ দ্বেষ মোহ সংস্কার থাকে না। তখনকার অবস্থায় চ্যুতি থাকে না বলিয়া অচ্যুত ও অন্ত থাকে না বলিয়া অনন্ত। উহা অসংস্কৃত বা নিত্যস্থিতি। উহা অনুত্তর, অমৃতপদ। ইহাই পরম নির্বাণ। নিরোধ সত্যের ইহাই স্বরূপ। অনাদিকাল হইতে চিত্তের যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ—উৎপত্তি ও বিলয় বা জন্মমৃত্যুব মধ্য দিয়া ক্ষণিক পরিণামের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে এই পরম স্থিতিতে তাহার নিরোধ হয়। অর্হৎ দশাতে চিত্তের প্রবাহ নিবৃত্ত হয় না বটে, কিন্তু উহাতে কর্ম-ক্লেশের বীজ থাকে না ও পুনর্জন্মের হেতু থাকে না।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। কামাদি ভূমিত্রয় হইতে পৃথক না হইলে নির্ব্বাণ হয় না। কারণ এই তিনভুমিতেই তৃষ্ণা আছে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাই এই তিনভূমির চিত্তই লৌকিক চিত্ত। লৌকিকের মধ্যে কামলোকে ও ধ্যানলোকে (রূপ ও অরূপলোকে) ভেদ আছে। কামলোকে ও উর্ধ্বে পর পর ৬টি দেবলোক আছে, মধ্যে মনুষ্যলোক এবং নিম্নে ৪টি অপায়ভূমি অর্থাৎ নিরয়, তির্য্যক্, প্রেত ও অসুর। চরম বা ষষ্ঠ দেবলোকের নাম পরনির্মিত বশবর্ত্তী। কামচিত্ত ধ্যানচিত্ত নহে বলিয়া রূপ ও অরূপলোকে গতিশীল হয় না। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা ইহা ধ্যানচিত্তে পরিণত হইতে পারে। এইখান হইতেই সাধন জীবনের সূত্রপাত হয়। লৌকিক ও লোকোত্তর সাধনে ভেদ আছে। কিন্তু আপাততঃ লৌকিক সাধনের কথাই বলা হইতেছে। কামচিত্ত ধ্যানচিত্তে পরিণত হইলে ক্রমশঃ রূপ ও অরূপলোকে গতি হয়। কিন্তু ত্রিলোকেও জীবনের ধারা সমাপ্ত হয় না। কারণ কুশল কর্ম্মের ফলে ইহা বাড়িতে থাকে। জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায় না। লোকোত্তর চিত্ত হইলে এই

সঞ্চিত জীবন ক্ষীণ হইতে পারে নতুবা নহে। লোক হইতে লোকান্তরে যাইতে হইলেও উপচার সমাধির মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। সাধনার মূল স্তম্ভ হইল শীলানুশীলন। কারণ অশুদ্ধ ও অকুশলকাম চিত্ত ধ্যানের উপযোগী নহে। দশ বা পঞ্চশীলের অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া ধ্যানের অধিকারী হয়। একান্তবাস, বিক্ষেপ বর্জন প্রভৃতি ইহার সহায়ক। ভাবনার দ্বারাই ধ্যানচিত্ত গঠিত হয়। প্রথমে পরিকর্ম্ম ধ্যানের মধ্য দিয়া উপচার ধ্যানে প্রবেশ করিতে হয়। পরিকর্ম্ম ধ্যানে অবলম্বন থাকে তদ্‌গ্রহ নিমিত্ত। তদ্‌গ্রহ নিমিত্ত বস্তুত চর্ম্মচক্ষু দৃষ্ট আলম্বনের দৃঢ় চিন্তন অভ্যাসের ফলে স্পষ্টভাবে সদা উহার মনঃশ্চক্ষু দ্বারা দর্শন। উহার মূলে থাকে একাগ্রতার অভ্যাস। পরে ঐ আলম্বন উজ্জ্বল আকারে প্রস্ফুটিত হয়। উহাই অচল প্রতিভানিমিত্ত, যাহা আলম্বন করিয়া উপচার ধ্যান প্রবর্ত্তিত হয়। এই আলম্বন লাভ একাগ্রতার আপেক্ষিক উৎকর্ষের ফলস্বরূপ পরিকর্ম্ম ও তদ্‌গ্রহ নিমিত্ত চঞ্চল থাকে—কিন্তু প্রতিভাস নিমিত্ত শান্ত। ইহার উদয়ের ফলে চিত্তের ৫টি আবরণ নষ্ট হয় বা উত্থানশক্তি হীন হয়। ইহাই উপচার ধ্যান। এই চিত্তটি কামলোকের সৌমনস্য সর্গের জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কুশলচিত্ত অথবা শুষ্ক বিদর্শক অর্হৎস্থলে সৌমনস্য সংগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত ক্রিয়াচিত্ত। এই ধ্যানের সন্ততিতে মোট ৫টি ক্ষণ, বা মনোবেগাত্মক জীবন অঙ্গীকৃত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটি পরিকর্ম্ম—তখন শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা সমতা পায়। দ্বিতীয়টি উপচার—তখন চিত্ত অপর্ণার নিকটবর্ত্তী হয়। তৃতীয়টি অনুলোক—তখন অপর্ণার বিঘ্ন কাটে, যোগ্যতা বাড়ে—চতুর্থটি গোত্রভু—তখন কামগোত্র বা পৃথগ্‌ জনগোত্র অভিভূত হয় ও রূপগোত্র, অরূপগোত্র বা লোকোত্তরগোত্র প্রাপ্তির জন্য তদ্রূপযোগ্য আলম্ব গ্রহণ হয়। ইহার পরই অপর্ণাজবন। তখন conversion হইয়া গিয়াছে—কামচিত্ত হইয়াছে রূপচিত্ত বা তদ্রূপ কিছু। অনুলোমটি ও চিত্তফলটি খুব নির্ম্মল—ইহার পর ক্ষণটিই কামলোকের প্রকৃত ধ্যানচিত্ত—যার নাম উপচার ধ্যান। ইহার পরবর্তী ক্ষণটিই অপর্ণা জবন নামে প্রসিদ্ধ—ইহাই রূপলোকের ধ্যানচিত্ত।

যখন চিত্ত প্রতিভান নিমিত্তের উদয়ে আলোকিত হয় তখনই চিত্তের স্বাভাবিক ধ্যান প্রতিবন্ধকগুলি অপসৃত হইতে আরম্ভ হয়। এগুলি চিত্তের আবরণ বা পরদা। নিরুত্থান দশাই ইহাদের নাম। এই দশা না হইলে উপচার সমাধি জমে না, একাগ্রতা হয় না। একাগ্রতার পূর্ণতার জন্য অর্থাৎ

গোত্রভূক্ষণ হইতে অপর্ণা ক্ষণে আসার জন্য বিতর্কাদি ধ্যানাঙ্গপঞ্চকের উদ্ভব আবশ্যক হয়।

কামলোকে থাকিতে থাকিতেই আবরণগুলি নিষ্ক্রিয় হইতে আরম্ভ হয়। চিত্তের বিশুদ্ধ বৃত্তি একটি ধ্যানাঙ্গ। ইহার দ্বারা চিত্তের স্ত্যানমন্দ, জড়তা বা তমোভাব স্তম্ভিত হয়। বিতর্কের টানে চিত্ত আলম্বনকে গ্রহণ করে তাহাতে চিত্তের জড়তা নষ্ট হয়। ইহা মননাত্মক চিন্তা। তারপর বিচার হইতেছে ঐ আলম্বনে ডুবিয়া যাওয়া। যাহাতে উহার স্বভাব প্রজ্ঞাত হইয়া যায়। প্রজ্ঞা দ্বারা ইহার ফলে চিত্তের বিচিকিৎসা দোষ নিবৃত্ত হয়। বিচিকিৎসা বা সংশয় কাটিয়া গেলেই চিত্ত স্বভাবতই প্রসন্নতা লাভ করে। ইহা প্রীতি। ইহা চিত্তের ব্যাপাদ বা উৎকণ্ঠা দূর করে। প্রীতি এলেই আসে সুখ। তখন চিত্ত শান্ত হয়, ইহার ঔদ্ধত্য কৌবৃত্য দূর হয়। এতদূর অগ্রসর হইতে পারিলে চিত্ত পূর্ব্বগৃহীত আলম্বনে একাগ্র বা নিশ্চল হয়। ইহার প্রভাবে চিত্তের কামচ্ছন্দ বা স্বেচ্ছাবিহার নষ্ট হয়। ইহারই পূর্ণাবস্থা অপর্ণা। ইহা রূপলোকে প্রবেশ।

শীলাভ্যাস করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সম্যক্ সমাধির দ্বারা সম্যক্ স্মৃতি ও ব্যায়ামের সাহায্যে কুশলরূপ চিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে।

আসল কথা, এই পৃথক্ জনগোত্র ত্যাগ করিয়া লোকোত্তর গোত্রে আবর্তন না হইলে মার্গক্ষণের উৎপাদ ও নিরোধ হয় না। মার্গক্ষণটিই সাক্ষাৎকারের ক্ষণ। এই একটি ক্ষণে একই সময়ে (যুগপৎ) ৪টি সত্যের প্রত্যক্ষ হয়—দুঃখের তৎকারণ অবিদ্যার বা পরামর্শ হয়, ও বিচিকিৎসার নিবৃত্তি হয় ও অষ্টাঙ্গমার্গের অনুশীলন হয়। তখন আর পৃথগ্ জনগোত্র থাকে না, লোকোত্তরগোত্রে আবর্তন হয়। এই একটি ক্ষণে ৪টি সত্যের প্রত্যক্ষ হয়—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও তাহার প্রাপক। এইটি স্রোতাপন্ন মার্গচিত্ত। সে স্রোতে এই চিত্ত পতিত হইলে তাহার গতি সদা নির্ব্বাণের দিকে। ভবাঙ্গস্রোত ছিন্ন হইবার পর কামলোকের সৌমনস্য সর্গের সম্প্রযুক্ত কুশলচিত্ত জবন স্থানে ৪ ক্ষণ জাবিত হয় মলবুদ্ধি পুরুষ স্থলেও ৩ ক্ষণ হয়, উহাও বুদ্ধিপুরুষ স্থলে। এই স্রোতে পড়িলে আর অপায় হইতে পারে না—সদ্‌গতিই হয়। ব্যাসভাষ্যে যে উভয়তোবাহিনী চিত্তনদীর কথা আছে, যাহা কল্যাণবহা ও পাপবহা উভয়—ইহাই ঐ চিত্তনদীর কল্যাণবাহী স্রোতঃ। কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গা ইহারই পৌরাণিক প্রতীক। তখন পশ্চাতে দেখা যায় অনাদিকালের অজ্ঞান কালিমা. বর্তমানে দেখা যায় সংবর্তমানের অনুভূত দুঃখরাশি, যাহা ব্যাপক। সম্মুখে দেখা যায় পথ ও

লক্ষ্যস্থল বা নির্বাণ। অপর্ণা বা পূর্ণ সমাধি অবস্থায় চিত্ত জাগ্রৎ হয়, কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়। ইন্দ্রিয়ার্থ যোগ সত্ত্বেও মনস্কামের অভাব বশতঃ স্পর্শ উৎপন্ন হয় না।

রূপধ্যানই শমথ। ইহার প্রভাবে চিত্ত শক্তিশালী হয় ও প্রজ্ঞার যোগ্য হয়, যথাভূত দর্শনের উপযোগী হয়। চিত্তে একটা যোগ্যতা আবির্ভূত হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞান সহকারে দেখা আবশ্যক যে এই চিত্তে স্কন্ধপঞ্চকের যা কিছু উদিত হয় সবই অনিত্য দুঃখময় ও অনাত্মক। ইহা বুঝিয়া চিত্তকে ঐ সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া নির্ব্বাণের দিকে উন্মুখ করিতে হয়। তখন বেশ বুঝা যায় যে ইহাই প্রকৃত শান্তি। বিরাগ বা নিরোধ ইহারই নামান্তর। যখন এই শান্তির প্রতিও তৃষ্ণা জন্মিবে না তখনই জানা যাইবে ইহাই প্রকৃত নির্ব্বাণ। কিন্তু তৃষ্ণা জন্মিলে নির্ব্বাণকে অবলম্বন করিয়া লোকোত্তর চিত্তের গঠন সম্ভবপর হয় না বরং ঐ তৃষ্ণা বিপক হইলে রূপলোকে জন্মগ্রহণ আবশ্যক হয়।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃত জীবন লাভের ক্রমনিহিত গূঢ় রহস্যটি বুঝা যাইবে। প্রজ্ঞা ভিন্ন তৃষ্ণা ক্ষয় হয় না—তৃষ্ণাক্ষয় ব্যতীত প্রকৃত শান্তি হইতে পারে না। তৃষ্ণা ও যাবতীয় সংস্কারবীজ চিত্তে নিহিত আছে—এই সংস্কারনাশক জ্ঞানাগ্নিও গুপ্তরূপে চিত্তেই আছে। উহাকে জাগাইয়া উহার আলোকে সত্যদর্শন আবশ্যক ও তাহার ফলে অজ্ঞান ও তৎকার্য দাহ স্বতঃসিদ্ধ। তাই চিত্তকে একাগ্র করিয়া প্রথমে জ্যোতির্ময় আলম্বন ধরিতে হয়, পরে তাহাকে আলম্বন করিয়া চিত্তগত মলনাশের ফলে পূর্ণ একাগ্রতা সিদ্ধ করিতে হয়। একাগ্রতা পূর্ণ হইলেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় ও মলিনতা অপসৃত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর সিদ্ধ হয়। গোত্রভূ অবস্থা না আসিলে উর্ধ্বস্রোতে চিত্ত পতিত হয় না। নির্বাণ সাক্ষাৎকারের ফলেই নির্বাণ হওয়া—নির্বাণ লাভ সম্ভবপর। কারণ যে চিত্ত লোকোত্তর নহে তাহা কখনই পরম শান্তি পায় না এবং নির্বাণ সাক্ষাৎকার না হইলে চিত্তও লোকোত্তর হইতে পারে না।

পাতঞ্জল যোগসাধনাতেও ক্রিয়াযোগ হইতেই সমাধিযোগের উন্মেষ সম্ভবপর। তপস্যা স্বাধ্যায় (জপাদি) ও ঈশ্বর প্রণিধান হচ্ছে ক্রিয়াযোগ। ইহার ২টি ফল—ক্লেশের তনুকরণ ও সমাধির ভাবনা। ক্লেশ তনুকৃত হইলে ক্ষীণ হয় বটে, কিন্তু দগ্ধ হয় না। তাহা সমাধিজাত প্রসংখ্যানাগ্নির দ্বারা ঘটে। একাগ্রভূমির সম্প্রজ্ঞাত যোগেই ইহার অনেকটা নিষ্পন্ন হয়। পরে নিরুদ্ধবৃত্তিক সংস্কারশেষ চিত্তও বিবেকখ্যাতির চরমাবস্থায় অস্তমিত হয়। পরে

বিশুদ্ধ চিতিশক্তিই থাকে, প্রকৃতির আবরণ আর থাকে না, কর্ম্মবীজ, অবিদ্যাবীজ প্রভৃতি কিছুই তখন থাকে না। উহাই নির্বীজ স্থিতি। তান্ত্রিক সাধনাতে শক্তিই মুখ্য সহায়ক। উপনিষদে আছে—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। তান্ত্রিকগণও নানাভাবে এই বল বা শক্তির উপরই জোর দেন। প্রজ্ঞাপারমিতা, পদ্মাবতী প্রভৃতি মহাশক্তিরই স্বরূপ। শাক্ত সাধনার বহু স্তর আছে—বহু প্রকার বৈচিত্র্য আছে। সর্বত্রই ইহা স্পষ্ট যে মনুষ্যদেহে কুণ্ড-লিনীরূপে এই মহাশক্তি সুপ্ত রহিয়াছে। তাহাকে পূর্ণ রূপে প্রবুদ্ধ করাই স্বয়ং পূর্ণতা লাভের মুখ্য উপায়।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের সাধনাগত একটা বৈশিষ্ট্য আছে। হীনযানে সাধারণতঃ নিজের নির্ব্বাণ বা আনন্দ থাকে লক্ষ্য—মহাযানের সাধনা নিজানন্দ প্রধান নহে, জগৎকে আনন্দ দেওয়াই প্রধান। শুধু শিষ্য হওয়া মুক্তিলাভ নহে কিন্তু গুরু হওয়া, অন্যকে মুক্ত করা—ইহাই লক্ষ্য। হীনযানে সকলের পক্ষে বুদ্ধত্ব লাভ সম্ভাবিত নহে, মহাযানে মনুষ্য মাত্রই বুদ্ধগোত্র, তাই সকলের পক্ষে উহা সম্ভবপর। করুণার বল আছে। প্রজ্ঞাও বিশিষ্ট। কারণ শ্রুতচিন্তাভাবনাময়ী প্রজ্ঞা হইতে ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞার মহত্ত্ব অধিক।

অখণ্ড মহাপ্রকাশ ও তাহার অভিব্যক্তির ক্রম

প্রশ্ন ঃ—অখণ্ড মহাপ্রকাশ বলতে কি বুঝায়? ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ঃ—মহাশক্তি জগদম্বার পরম রূপ অখণ্ড ও স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্য—ইহাকে সিদ্ধ যোগিগণ সংবিৎ বা প্রতিভা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কোন দেশে বা কোন কালে কোন কারণেই স্বরূপের অপলাপ হয় না—ইহা অপরিচ্ছন্ন প্রকাশাত্মক। ইহা বিচিত্র দৃশ্যের আকারে ভাসমান হইতেছে—এই সব আকার মূলে সবই ক্ষণিক, কিন্তু এই ক্ষণিক প্রতিভাসের মধ্যেই তাহাদের স্বরূপ পর্য্যবসিত নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে স্মরণ, অনুসন্ধান প্রভৃতি অন্তঃকরণের ব্যাপারের কোন সার্থকতা থাকিত না। ভগবতীর যেটি পরম স্বরূপ সেইটি সামান্য জ্ঞানাত্মক পরা প্রতিভা। উহাই মূলরূপ এবং দেশ, কাল, আকার, নিমিত্ত প্রভৃতি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যক্ষসিদ্ধ সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হয়, স্থিত হয় ও লীন হয়। নব নব রূপে

আভাসমান হওয়াই উৎপত্তি, আভাস ধারার বিবরতাই স্থিতি ও আভাসের অবিবরতাই সংহার। এই সকল দৃশ্য বা অর্থ প্রমাতৃগণের নিকটে পর পর ভাসমান হয় বটে, কিন্তু স্বরূপ হইতে পৃথক্ ভাবে ভাসমান হয় না। ভূতলে অবস্থিত ঘট যেমন ভূতল হইতে ভিন্নভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা তদ্রূপ নহে, বরং দর্পণে প্রতিবিম্বিত রূপ যেমন দর্পণ হইতে অভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়, ইহা সেই প্রকার। অর্থাৎ এই বিশ্ব চিদাত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিদাত্মার সহিত অভিন্নভাবেই প্রকাশমান হয়, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ভান ঐ পরম চৈতন্য-স্বরূপে উহা হইতে অব্যতিরিক্তভাবেই ঘটিয়া থাকে।

এই অখণ্ড মহাপ্রকাশে বিশ্ব-বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয় কেন? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায়, ইহা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য হইতেই হইয়া থাকে। ইহাই মায়ার প্রকৃত স্বরূপ। মায়ারূপ নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া তার সংবিৎ রূপ আধারে অনন্ত বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। এই জগদাকার দেহে অজ্ঞানী, অর্থাৎ যে আত্মজ্ঞানহীন বা যাহার মন অবিদ্যা দ্বারা আবৃত সে, বিশ্বরূপ অনন্ত আকার দর্শন করে; কিন্তু এই সকল আকার যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয় তাহাকে দেখিতে পায় না। অবিদ্যা মায়ারই অবস্থান্তর। কামলা (jaundice) রোগে আক্রান্ত রোগী যেমন নেত্রগত বিকার বশতঃ শ্বেতবর্ণ শঙ্খকে পীতবর্ণ দেখিয়া থাকে, অজ্ঞানীর জগৎ দর্শনও কতকটা সেইরূপ। বিদ্যার প্রভাবে অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ যোগ-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঐ সংবিৎরূপ তত্ত্ব দৃশ্যমান দ্বৈতাকারবর্জিত কিংবা নির্বিকল্পকরূপে প্রতিভাত হয়। অবশ্য ঐ অবস্থায়ও ভাস্য ও ভাসক রূপ দ্বৈত থাকে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চিদ্রূপ আত্মসত্তাতে দেহাদি দৃশ্য ও ভাস্যের লেশমাত্রও থাকে না—উহা বিশুদ্ধ অহং রূপে অর্থাৎ শুদ্ধ দ্রষ্টা রূপে ভাসিতে থাকে। যোগিগণের নিকট আত্মতত্ত্ব দেশ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন বলিয়া গম্ভীর ও স্তিমিত সমুদ্রের ন্যায় নিশ্চল স্বরূপে অর্থাৎ অনন্ত অদ্বয়রূপে প্রকাশমান হয়।

যাঁহারা পরমাত্ম-তত্ত্ববিদ্ ভক্ত তাঁহারা এই বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের ভজন করিয়া থাকেন। এই ভজনে কৈতব নাই অর্থাৎ কাপট্য নাই এবং কৃত্রিমতাও নাই, কারণ স্বভাবতঃ আত্মাই তো সর্বাপেক্ষা প্রিয়। ইহার নাম অদ্বৈত ভক্তি। এই অদ্বিতীয় পরমাত্মা বস্তুতঃ সকলেরই নিজ আত্মা। সেখানে সেব্য-সেবক ভাব নাই। কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত ভেদভাবকে আহরণ করিয়া সেব্য-সেবক ভাব রচনা করেন—তাঁহারা স্বাত্মস্বরূপ অদ্বয় পদ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াও স্বভাব বা চিত্তের সরসতাবশতঃ এইরূপ করিয়া থাকেন। বাসনার বৈচিত্র্য

বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। কোন কোন জ্ঞানী পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ যেমন রাজ্য-শাসনাদি করেন, তেমনি কেহ কেহ ঐ কারণেই ভজন করিয়া থাকেন।

ভগবতীর পরম রূপ শুদ্ধ ভাসক, কিন্তু ভাস্য নহে। উহা ভা-স্বরূপ, উহা অন্য বস্তুর সঙ্গে সংসৃষ্ট নহে বলিয়া এক-রসাত্মক, তাই পূর্ণ, সেইজন্যই উহা দেশ ও কালেরও ব্যাপক। যদি ভাস্যরূপ আকার ভা-রূপ ভাসক হইতে ভিন্ন হইত তাহা হইলে তাহার ভানই হইত না। ভান হওয়া ভাস্য বস্তুর ধর্ম্ম নহে, কারণ যদি উহা ভাস্যের ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে সর্বদাই ভাস্যের ভান হইত। তাহা ছাড়া আত্মগতরূপে ভানের অনুভবও হইত না।

এই যে ভান বা প্রকাশের কথা বলা হইল ইহাই পরম চৈতন্যস্বরূপা পরমেশ্বরী মহাশক্তি জগদম্বা, ইহা এক ও অদ্বিতীয়; ইহা দ্বৈতের লেশমাত্র সহ্য করে না। এই অখণ্ড চিদেকরস স্বরূপে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ বৈচিত্র্যময় বিশ্ব প্রতিভাসমান হয়। বিশ্বই 'দ্বিতীয়' রূপে প্রতিভাত হয়—বস্তুতঃ উহা এক হইতে অভিন্ন, উহাই প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্ব থাকুক অথবা না থাকুক চৈতন্যের স্বরূপ সর্ব্বদাই নির্বিকল্প। সৃষ্টিকালে প্রতিবিম্ব ভাসে কিন্তু প্রলয়কালে উহা ভাসে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সংবিৎ স্বরূপতঃ সর্বদা নির্বিকল্প এক রস থাকিলেও স্বাতন্ত্র্যবশতঃ নিজের মধ্যে নিজের বাহ্যভাবের স্ফুরণ করে।

এই পরা সংবিৎ মায়ের স্বরূপ। নিজের আত্মার শুদ্ধস্বরূপ জানিলেই 'মা'কে প্রায় জানা হয়—

"জ্ঞাতস্বাত্মস্বরূপো বৈ ততো জ্ঞাস্যসি মাতরম্"

আত্মরূপ দৃশ্যও নয়, বাচ্যও নয়, তাই এতৎ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ উপদেশও চলে না। তবে ইহা বলা চলে যে, বিষয়াকারহীন বুদ্ধিতে করণ ব্যাপারের অপেক্ষা না করিয়াই 'স্বরূপ-জ্ঞান' উৎপন্ন হয়। কারণ, এই স্বরূপ দেবাদি তির্য্যগন্ত সকল প্রাণীরই আত্মরূপে ভাসমান হয়। তথাপি উহা যে আমাদের নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না, তাহার কারণ এই যে দৃশ্য আকার দ্বারা আমাদের বুদ্ধি আচ্ছাদিত। তথাপি মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় কিঞ্চিৎ প্রকাশ থাকে, ঐ প্রকাশের দ্বারাই সর্বদা সর্বত্র সকলের নিকট সকল পদার্থ ভাসমান হয়। সুতরাং আত্মাই সর্বদা ভাসমান হইলেও কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত হয়। করণের ব্যাপার কর্তাতে প্রবৃত্ত হয় না, তাই আত্মদর্শনে আচার্য্য বা গুরুর সাক্ষাৎ কোন উপযোগ নাই। পরাগ্ দৃষ্টি

শিষ্যের নিকট আত্মা অত্যন্ত দূরে। গুরু তাহার প্রত্যগ্‌ দৃষ্টি উৎপাদন করিয়া দেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে আত্মা যে নিত্য 'সন্নিহিত' তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এই পরা সংবিৎ বা আত্মাই মহাশক্তি 'মা'—ইনি সর্বদাই বিকল্পশূন্য। দর্পণ যেমন সর্বদাই দর্পণ, প্রতিবিম্ব ভাসুক আর নাই ভাসুক দর্পণ দর্পণই থাকে,—তদ্রূপ সৃষ্টি বা প্রপঞ্চের প্রকাশকালেও চৈতন্য যেমন নির্বিকল্প তদ্রূপ প্রপঞ্চের সংহারকালেও উহা তদ্রূপই নির্বিকল্প থাকে। সৃষ্টি ও সংহারে চৈতন্যের কোন বিকার হয় না। চৈতন্য সব সময়ে চৈতন্যই· তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(২)

ভগবতী জগদম্বার পরমরূপ অখণ্ড একরস চৈতন্য· ইহা বলা হইল। কিন্তু তাহার অপর রূপও তো আছে। কিন্তু তাঁহার পরমরূপে নিরাকার, অপর রূপে সাকার। যোগিগণ বলেন· তাঁহার অনন্ত সাকার রূপে আছে। কিন্তু সেই সকল রূপের ঊর্ধ্বে একটি প্রধান রূপ আছে, যাহার তুলনায় অন্য সকল রূপই অপ্রধান রূপে পরিগণিত হয়। এই প্রধান রূপটি এক ও অভিন্ন। ইহা যাবতীয় অপ্রধান অপর রূপের শিখরস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অপর রূপটি এক হইলেও তাহা যে কি প্রকার তাহা ভাষাতে বর্ণনা করা চলে না, কারণ রুচিভেদে, বাসনাভেদে ও দৃষ্টিভেদে সেই শিখরস্থিত এক রূপই এক এক ভক্তের নিকট এক এক ভাবে প্রতিভাত হয়।

আমরা এখানে একটি বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়া সেই প্রধান অপর রূপের ধাম ও স্বরূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। যে পরম ধামে এই প্রধান অপর রূপ বিরাজমান রহিয়াছেন তাহার স্বরূপ· অনুধাবন করিতে হইলে বিশ্ব সংস্থানের একটা ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা যাহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলি তাহাতে চতুর্দশ ভুবন বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে সাতটি ঊর্ধ্ব ভুবন এবং সাতটি অধোভুবন। পাতাল· নরকাদি অধোভুবনের অন্তর্গত। ভূলোক হইতে সত্যলোক পর্যন্ত ঊর্ধ্ব ভুবন বলা চলে। অন্তরিক্ষ ও স্বর্গাদি ইহারই অন্তর্গত। প্রত্যেকটি ভুবন এক একটি স্তর। প্রতি স্তরকে অবলম্বন করিয়া অগণিত লোক লোকান্তর রহিয়াছে। এইসব নিয়াই একটি ব্রহ্মাণ্ড। এই প্রকার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ঊর্ধ্বে অন্যান্য বিভাগও আছে। তাহাতে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ স্তর বিন্যাসও পরিদৃষ্ট হয়। এইসব নিয়া সমগ্র বিশ্বরাজ্য। ইহার বাহিরে সৃষ্টির কোন

নিদর্শন নাই। অনন্তব্যাপী জ্যোতিরাশি বিরাজ করিতেছে। এই জ্যোতির ঊর্ধ্বে অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশ বিদ্যমান। যোগিগণ বলেন, চিদাকাশের মধ্যে একটি দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্র বিরাজ করিতেছে, ইহাকে সুধাসিন্ধু বা অমৃতের সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই মহাসমুদ্রের মধ্যে কেন্দ্রস্থলে নবরত্নমণিরচিত নবখণ্ডাত্মক একটি দ্বীপ আছে। ইহাকে মণিদ্বীপ* বলে। এই দ্বীপের মধ্যে আছে বন, তাহাতে আছে চিন্তামণি-গৃহ বা মন্দির। সেই

---

* মণিদ্বীপের বিস্তারিত বর্ণনা দেবী ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে (১০-১২) অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ললিতোপাখ্যানে ও শিবরহস্যেও (অধ্যায় ১৩) ইহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। "চণ্ডী" নামক হিন্দী মাসিকপত্রের একাদশ খণ্ডে শ্রীহরি শাস্ত্রী দাধীচ লিখিত 'মণিদ্বীপ কা সৈর' নামক যে অনুভূতিমূলক লেখমালা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অনেকাংশে দেবী ভাগবতের বর্ণনার অনুরূপ। ইহা শাক্তগণের বিবরণ। কিন্তু বৈষ্ণবগণও এই মণিদ্বীপের বর্ণনা করেন। সুন্দরী তন্ত্রের অন্তর্গত আলমন্দার সংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ও পুরাণ সংহিতার ৩২শ অধ্যায়ে ভগবানের নিজ ধামরূপে এই দ্বীপের বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, ইহা সুপ্রসিদ্ধ শ্বেতদ্বীপ হইতে বিভিন্ন। আলমন্দার সংহিতা অনুসারে ভগবানের পারমার্থিক বা বাস্তবী লীলা এই স্থানেই হইয়া থাকে। এই স্থান অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়রূপে চিদাকাশে অবস্থিত। বস্তুতঃ এখানকার ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ সবই চিন্ময়। সেখানে আছে সুধা-সমুদ্র, তার মধ্যে মণিদ্বীপ—"সুধাব্ধিস্তত্র বিততঃ, কোটিযোজনকস্য চ। তস্য মধ্যে চ কোট্যর্দ্ধযোজনং মণিদ্বীপকম্।" এই দ্বীপে নবরত্নময় নয়টি খণ্ড আছে, যাহাতে নবরসের লীলা নিরন্তর চলিতেছে। ইহার মধ্যে মধ্য খণ্ড, যাহা পদ্মরাগ মণিময়, শৃঙ্গারশালা বিদ্যমান। ইহাই আনন্দভূমি। অষ্টদল কমলের ইহাই যেন কর্ণিকা। ইহার আটদিকে আটটি খণ্ড আছে। আলমন্দার সংহিতা মধ্যে নিত্য বৃন্দাবনের লীলা এবং ব্রজভূমির লীলা ব্যবহারিক। পুরাণ সংহিতাতে যে বর্ণনা আছে তাহাও প্রায় এইরূপ। তাহাতে আছে—

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রপঞ্চাদ্ বহিরুদ্গতঃ।
চিদাকাশো মহানাস্তে লীলাধিষ্ঠানমদ্ভুতম্ ॥
যত্র দিব্যসুধাসিন্ধুঃ কোটিযোজনবিস্তৃতঃ।
* * * *
কোট্যর্ধমানতস্তস্মিন্ মণিদ্বীপো মনোহরঃ।
নবখণ্ডাত্মকঃ শ্রীমান্ নবরত্নবিভূষিতঃ ॥ ইত্যাদি।

ইহার মধ্যভূমিতে "অখণ্ড মণিজ" মূল মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

মন্দিরে আছে পঞ্চব্রহ্মময় মঞ্চ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর এই মঞ্চের চারিপাদ। মঞ্চের উপর ফলকরূপে আছেন সদাশিব, ইহাই মুখ্য আসন। এই আসনের উপরে অনাদিমিথুন-পরচৈতন্যময় পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরী অভিন্নরূপে বিরাজ করিতেছেন। পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতিরূপে ইহারা সাধকগণের নিকট পরিচিত।

ইহাই বিশ্বজননীর প্রধান অপর রূপ (অবশ্য এক দিক দিয়া দেখিলে)। ভগবতীর অথবা ভগবানের যেটি পরম স্বরূপ তাহা সংবিৎ-মাত্র। সৃষ্টিমুখে সেই নিরাকার সংবিৎই নিত্য যুগলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।*

মণিদ্বীপের বিশেষ আলোচনা আমরা এখানে করিব না, কিন্তু এই স্থলে জগদম্বার অপ্রধান অপর রূপের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। সদাশিব, ঈশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা ইঁহারা অধিকারী পুরুষ। মায়ের অনুগ্রহাদি পঞ্চকৃত্য ইঁহারাই সম্পাদনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা সকলেই মায়ের এক একটি রূপ। এতদ্ব্যতীত গণেশ, স্কন্দ, দিক্‌পালগণ, কুমারী, লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তিবর্গ এবং যক্ষরক্ষ, অসুর নাগ, কিম্পুরুষ প্রভৃতির মধ্যে যাবতীয় পূজ্যরূপে বস্তুতঃ মায়েরই রূপ। তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারে না। তিনি ব্যতীত পূজ্য বা ফলদায়ী আর কেহ নাই। যে যেভাবে তাঁহাকে ভাবনা করে সে সেই ভাবেই ফললাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তিনি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন দেশে জীবানুগ্রহের জন্য বিরাজ করিতেছেন। মূলে সব রূপ

---

* সাধকগণ মহাষোঢ়া ন্যাসে ব্যস্ততনু হইয়া অনন্যচিত্তে এই স্বরূপেরই ধ্যান করিয়া থাকেন। শ্রীক্রমোত্তম নামক গ্রন্থে আছে যে, নিম্নলিখিত প্রকারে ভাবনা করিতে হইবে। সর্বপ্রথম অমৃত সমুদ্র, তার মধ্যে সুবর্ণদ্বীপ, তাতে কল্পবৃক্ষ বন, তাতে নবমাণিক্য মণ্ডপ, তাতে নবরত্নময় সিংহাসনরূপী কমল। এই কমলের মধ্যে আছে ত্রিকোণ এবং ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বিরাজ করিতেছে। ইহার লাবণ্য কোটি কন্দর্পকে লজ্জিত করে, ইহার মুখ-কমল মন্দ মন্দ স্মিতযুক্ত, নেত্র তিনটি, ললাটে চন্দ্র এবং বসন ও আভরণ সবই দিব্য। ইনি চতুর্ভুজ—হাতে আছে কপাল পাত্র, চিন্মুদ্রা, ত্রিশূল ও পুস্তক। মুখ ও চক্ষু সদানন্দময়। শ্রীক্রমোত্তমে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির ধ্যানের কথা আছে। তবে ইহাও বলা হইয়াছে যে ঐ মূর্তিকে শুদ্ধ পুরুষরূপে বা মাতৃরূপেও ধ্যান করা চলে। নিষ্কল ধ্যানের ত কথাই নাই। ভাবনোপনিষদ্, তন্ত্ররাজ প্রভৃতিতে এই মানবদেহকেই নবরত্নদ্বীপ ও পুরুষার্থকে সাগর ভাবনা করিতে বলা হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

তাঁহারই রূপ। শাস্ত্রানুসারে তিনি কাঞ্চীতে কামাক্ষীরূপে, কেরলে কুমারীরূপে, আনর্ত্তে অম্বারূপে, মলয়ে ভ্রামরীরূপে, করবীরে মহালক্ষ্মীরূপে, মালবে কালিকারূপে, প্রয়াগে ললিতারূপে, বিন্ধ্যে বিন্ধ্যবাসিনীরূপে, বারাণসীতে বিশালাক্ষীরূপে, গয়াতে মঙ্গলাবতীরূপে, বঙ্গে সুন্দরীরূপে ও নেপালে গুহ্যেশ্বরীরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই তাঁহার দ্বাদশরূপ। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও অসংখ্য রূপ শাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়।

(৩)

মায়ের মুখ্য ঐশ্বর্য্য অপরিচ্ছিন্ন। স্বরূপ হইতে ভিন্ন কোন কারণ অপেক্ষা না করিয়াই তিনি জগতের আকারে স্ফুরিত হইতেছেন। এই সকল আকারকে তাঁহার স্বাংশ বা তাঁহা হইতে ভিন্নও বলা চলে না, কারণ তিনি অখণ্ড চিন্ময় বলিয়া তাঁহার কোন অংশ নাই। তিনি অদ্বয় চিন্ময় স্বরূপে স্থিত থাকিয়াও অনন্ত জগতের আকারে স্ফুরিত হইতেছেন। আবার অনন্ত জগদাকারে স্ফুরিত হইয়াও তিনি অদ্বৈত চিৎ স্বরূপ হইতে স্খলিত হন না। ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। বিচিত্র জগদাকার প্রতিবিম্বতুল্য বলিয়া তিনি নিত্যই নির্বিকার।

মায়ের অবান্তর ঐশ্বর্য্যেরও গণনা হয় না। ঐশ্বর্য্য মাত্রই অঘটিত ঘটনের সামর্থ্য। পরম স্বাতন্ত্র্য-রূপা স্ব-মায়া দ্বারা তিনি নিজেকে অজ্ঞানাবৃত করেন ও অনাদি জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে পতিত হন অর্থাৎ সংসারী সাজেন। তারপর শিষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় গুরুর সকাশ হইতে আত্মতত্ত্ব জানিয়া নিত্য-মুক্ত হইয়াও আবার মুক্ত হ'ন। এই অবিদ্যা মায়িক বলিয়া সত্য সত্য বন্ধন নাই। তাই তিনি নিত্য-মুক্ত। বিনা উপাদানে তিনি অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎ নির্ম্মাণ করেন, ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। তাঁহার এইরূপ অগণিত ঐশ্বর্য্য আছে।

(৪)

মায়ের অপ্রধান পরম ধামের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু খণ্ড খণ্ড ধাম যে তাঁহার কত আছে তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। এইখানে শাস্ত্রানুসারে বিভিন্ন সাধক ও যোগীর অনুভূতিমূলক কয়েকটি ধামের বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

(i) শ্রীনগর—ইহার প্রাচীন নাম অতস্তদীয়। প্রসিদ্ধ আছে যে মেরুতে চারিটি শৃঙ্গ আছে—ইহার তিনটি শৃঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের তিনটি পুরী আছে, চতুর্থটিতে মহামায়ার পুরী বিরাজ করিতেছে। ইহার নাম শ্রীপুর বা শ্রীনগর। ইহা চারিশত যোজন দীর্ঘ ও চারিশত যোজন আয়ত। ইহা সাতটি প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশ-দ্বার চারিটি। প্রবেশ-স্থানে শালা, গোপুর প্রভৃতি আছে। বাহিরের প্রাকারটি লৌহের, ভিতরেরটি সুবর্ণের। ভিতরের প্রাকারগুলি ক্রমশঃ পিতল, তাম্র, সীসা, দস্তা, পঞ্চলৌহ ও বজ্র নির্মিত। প্রতি প্রাকারই যেন এক একটি দুর্গ, সর্বত্রই রক্ষক ও দুর্গপালের ব্যবস্থা আছে। লৌহ-দুর্গের রক্ষক মহাকালগণ ও তাঁহাদের শক্তি। ইঁহারা ভগবতীকে কালচক্রে উপাসনা করেন। কাল-চক্রটি ত্রিকোণ, পঞ্চকোণ, ষোড়শদল ও অষ্টদল কমল। অন্যান্য ছয়টি দুর্গের রক্ষক শক্তিসহ ছয়টি ঋতু। এই সকল চক্রে ত্রিশটি শক্তি কার্য্য করিতেছে—মধুশুক্লা এক হইতে পনর ও মধুকৃষ্ণা এক হইতে পনর। এখানে বহু শালা আছে যাহাতে গন্ধর্ব অপ্সরা নাগ যক্ষ ও রুদ্রগণ বাস করে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে প্রায় পঁচিশটি শালার উল্লেখ আছে। এক একটি শালা যেন এক একটি দুর্গ। বিভিন্ন শালা বিভিন্ন উপাদানে রচিত। অষ্টধাতুর একটি শালা আছে। উভয় শালার মধ্যে বৃক্ষের ঝাড় ও কুঞ্জ বিদ্যমান। যেমন সুবর্ণ ও রজত শালার মধ্যে কদম্ব-বন-বাটিকা, যেখানে মন্ত্রিণী বাস করেন। এগারটি শালা মহামূল্য রত্নময়—পুষ্পরাগ, পদ্মরাগ, গোমেদ, বজ্র, বৈদূর্য্য, ইন্দ্রনীল, মুক্তা প্রভৃতি রচিত। মৌক্তিক শালাটিতে চক্রমধ্যে (যাতে ষোলটি ঘের আছে) মহারুদ্র বাস করেন। তিনিও সর্বদা ভগবতীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁহার চারিদিকে রুদ্রগণ ও রুদ্রাণীগণ ঘের করিয়া আছেন। এই সকল রুদ্রই দুর্গরক্ষক। কেহ উপবিষ্টা, কেহ জাগ্রৎ, কেহ সুপ্ত, কেহ দণ্ডায়মান এবং কেহ ধাবমান।

(ii) আর একটি নগরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যেখানে ভগবতী ললিতা ভণ্ডাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের পর বিশ্রাম করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আছে, বিশ্বকর্মা ও ময় এই নগর রচনা করিয়াছিলেন। যোগিসমাজে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে অগস্ত্য ঋষি মেরুস্থিত শ্রীমাতার নগর দর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি বেদবিৎ ও সর্বশাস্ত্র-বিশারদ হইলেও তন্ত্র-দীক্ষা রহিত ছিলেন বলিয়া পরাশক্তির নিগূঢ় উপাসনায় অনধিকারী ছিলেন। তাই উক্ত নগর দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহা নিয়তির নিয়ন্ত্রণ। পরে দেবীর মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হ'ন ও সপত্নীক সক্রম তান্ত্রিক দীক্ষা লাভ

করেন। ইহার পর তিনি লোপামুদ্রার সহিত উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার ফলে তিনি সস্ত্রীক গুরুমণ্ডলে উত্তম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন। (দ্রষ্টব্য—ত্রিপুরারহস্য, মাহাত্ম্য খণ্ড, অধ্যায় ৭৯)।

(iii) ভগবতী পূর্ব সাগর তীরে কামগিরিরূপে, পশ্চিমে সাগরতীরে পূর্ণগিরিরূপে ও মেরুসানুতে জলন্ধররূপে আছেন। বলা বাহুল্য, এই-গুলি প্রসিদ্ধ চতুষ্পীঠের অন্তর্গত।

(iv) ভাস্কর রায় তিনটি শ্রীপুরের কথা বলিয়াছেন। প্রথমটি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ঊর্ধ্বে অনন্ত যোজন বিস্তৃত ও পঁচিশ প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। দ্বিতীয়টি মেরুর উপরে সংস্থিত, উহা প্রথমটি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত। ভগবান্ দুর্বাসা ললিতা-স্তব-রত্নে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মেরুর মধ্যশৃঙ্গে অবস্থিত। মেরুপর্বতে শিব-ত্রিকোণবৎ তিনটি শৃঙ্গ আছে। উহাদের মধ্যে চতুর্থ ত্রিকোণ আছে চারিশত যোজন উচ্চ। ইহাতেও পঁচিশটি প্রাকারের কথা আছে এবং অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্যের বিবরণ আছে। তৃতীয়টি ক্ষীরসমুদ্র মধ্যে বিদ্যমান। শ্রীবিদ্যারত্ন সূত্রের ভাষ্যকার এই কথা বলেন। ইহার চতুর্বিংশতি প্রাকারের উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য—ললিতা-সহস্রনাম ভাষ্য, পৃঃ ৪, ৩৯-৪০)।

রুদ্রযামলে আছে যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ঊর্ধ্বে সহস্র কোটি যোজন বিস্তীর্ণ রত্নদ্বীপ বিদ্যমান। উহার পঁচিশটি প্রাকার পঁচিশটি তত্ত্ব দ্বারা রচিত (ললিত ভাষ্য, পৃঃ ৪০, ৪৩)। বস্তুতঃ এই রত্নদ্বীপ আমাদের পূর্ববর্ণিত মণিদ্বীপেরই নামান্তর।

(৫)

এই 'মা'ই গুরুরূপে ভাবনীয়। ভাবনোপনিষদে সর্বকারণভূতা শক্তি বলা হইয়াছে। তন্ত্ররাজেও আছে—

"গুরুরাদ্যা ভবেৎ শক্তিঃ সা বিমর্শময়ী মতা।
নবত্বং তস্য দেহস্য রন্ধ্রত্বেন বিভাসতে॥"

এই নবরন্ধ্রই দেহের প্রসিদ্ধ নবদ্বার। এই নবদ্বারের মধ্যে দুইটি শ্রোত্র ও বাক্ এই তিনটি দিব্যৌঘ, দুইটি চক্ষু ও উপস্থ এই তিনটি সিদ্ধৌঘ, এবং দুইটি নাসা ও পায়ু এই তিনটি মানবৌঘ। দেহের এই নয়টি রন্ধ্রই নবনাদের স্বরূপ। 'শিবসূত্রবার্তিকে'ও পরমেশ্বরের অনুগ্রহাত্মিকা পরা শক্তিকেই গুরু বলা হইয়াছে। সুতরাং মা ও গুরু অভিন্ন।

(৬)

এব্যর ভগবতীর প্রধান অপর রূপ ও পর রূপের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। অপ্রধান অপর রূপের প্রসঙ্গ এখানে উঠাইব না। কারণ জগতের সব রূপই তো তাঁহারই রূপ। যেটি প্রধান অপর রূপ তাহাই সৃষ্টির আদি ও বিশ্বের শিখরদেশে অবস্থিত। ইহাই শিব-শক্তির যুগল রূপ। এই শক্তিকে আমরা পঞ্চদশী বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। এই যুগল রূপই অনাদি দিব্য-মিথুন রূপে সাধক সমাজে পরিচিত। শ্রীচক্রের সর্বাপেক্ষা অন্তরতম চক্রের নাম বৈন্দব চক্র—মধ্য ত্রিকোণের অভ্যন্তরে নিত্যমণ্ডল অর্থাৎ পঞ্চদশী কলাবেষ্টিত মহাবিন্দু।* বস্তুতঃ পনরটি নিত্যার সাম্যাবস্থার নামই বিন্দু। এই বিন্দুকে বেষ্টন করিয়া তাহার ঘের রূপে পনরটি নিত্যা বিদ্যমান। এই সকল নিত্যা প্রতিপাদাদি পনরটি তিথির প্রতীক। সুতরাং এই নিত্যা মণ্ডল এক হিসাবে কালচক্রের প্রতিনিধি। সাধনের ক্রমবিকাশে একটি নিত্যা অপর নিত্যাকে লীন করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে আন্তর নিত্যার লয় সাধনপূর্বক আবর্তন সমাপ্ত করে। মনে রাখিতে

---

* চন্দ্রমণ্ডলে ষোল কলা। এই ষোল কলার মধ্যে পনেরটি কলা বেষ্টনাকারে চারিদিকে রহিয়াছে। মধ্যের কলাটির নাম সাদাখ্য—ইহাই ষোড়শী। এই পনের কলাই পনের তিথি। কামেশ্বরী হইতে চিত্রা পর্যন্ত পনেরটি নিত্যা ইহারাই। সাদাখ্য কলা ললিতা। এই কালাচক্র বা তিথিচক্র সর্বদা আবর্তিত হইতেছে—ইহার ভিতরে শ্রীচক্র। (দ্রষ্টব্য—ভাবনোপনিষদ ও ভাস্কর ভাষ্য ৩৩ সূত্র পৃঃ ৭৩৭—৭৩৮)। ইহার তাৎপর্য্য এই, কালরূপ প্রপঞ্চের মধ্যে শ্রীচক্র বিদ্যমান। দেশরূপ প্রপঞ্চের মধ্যেও শ্রীচক্র রহিয়াছে। ভূগোলের উত্তর ভাগে মেরু, তাহার দক্ষিণে জম্বু প্রভৃতি সাতটি দ্বীপ, তাহাদের অন্তরালে ভূগোলের বলয়াকার সপ্ত সমুদ্র। পুষ্কর দ্বীপের মেরু মধুর জলবিশিষ্ট সমুদ্র। তাহার দক্ষিণে—পরব্যোম। মেরু হইতে ব্যোম পর্যন্ত ষোল স্থানে ললিতা হইতে চিত্রা পর্যন্ত ষোলটি নিত্যা যুগ প্রথম বর্ষে স্থিত, দ্বিতীয় বর্ষে জম্বু দ্বীপ হইতে মেরু পর্যন্ত গমন করে, তৃতীয় বর্ষে লবণ সমুদ্র হইতে জম্বু দ্বীপ পর্যন্ত গমন করে। এই ষোড়শ বর্ষে পরব্যোম হইতে মধুর সমুদ্র পর্যন্ত ললিতাদি ষোড়শ নিত্যা অবস্থিত। এইভাবে ষোল ষোল বৎসরে নিত্যাগণের এক একটি আবর্ত্তন সংঘটিত হয়। শ্রীচক্র এই দেশরূপ চক্রের অন্তরে, বাহিরে নয়।

হইবে একটি নিত্যা অপর নিত্যাতে স্বয়ং লীন হয় না এবং উদ্বৃত্ত শক্তি দ্বারা তাহাকেও নিজের মধ্যে লীন করে না, বরং অপর নিত্যার স্বরূপে উন্নীত হইয়া অগ্রসর হয় ; তাই কর্ম চলিতে থাকে এবং সর্ব-সমাধানের পরও উদ্বৃত্ত শক্তি দ্বারা বিন্দুতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। স্বয়ং লীন হইয়া গেলে উহা সম্ভবপর হইত না। কালচক্রের আবর্তনই কর্ম বা উপাসনার প্রকৃত স্বরূপ। আবর্তন পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুতে প্রবেশ ঘটে। ইহাই পঞ্চদশী প্রাপ্তি। পঞ্চদশী সিদ্ধ হইলে আবর্তন থাকে না। অর্থাৎ যুগলকে প্রাপ্ত হইলে কুঞ্জলীলার অবসান হইয়া যায়, বৈষ্ণব সাধনার এই লীলা-রহস্য এই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পঞ্চদশী যুগল রূপ। এই যুগল রূপ হইতে ক্রমশঃ অদ্বয় স্বরূপে যাওয়াই গুহ্য সাধনার ইতিহাস। কিন্তু তাহার পূর্বে পঞ্চদশী হইতে ষোড়শী পর্যন্ত বিবর্তন আবশ্যক। এই যে যুগল রূপের কথা বলা হইল উহাতে পরমা প্রকৃতি পরম পুরুষের অঙ্কগত এবং উভয়েই চতুর্ভুজ। পঞ্চদশী হইতে ষোড়শীতে যাইতে হইলে শিবশক্তির সম্বন্ধ ক্রমশঃ অন্যরূপ ধারণ করে। শক্তি শিবে আশ্রিত ইহাই পঞ্চদশীর স্বরূপ, কিন্তু যতক্ষণ শক্তি শিবের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া শিবকে শবরূপে অথবা অন্ততঃ সুপ্তরূপে রক্ষা করিয়া শিব হইতে ঊর্ধ্বমুখে উদ্‌গত না হয় ততক্ষণ পঞ্চদশী হইতে ষোড়শী যাওয়ার কোন আশাই নাই। পঞ্চদশী কালচক্রের অতীত ইহা সত্য, কিন্তু অতীত হইয়াও বস্তুতঃ অতীত নহে। কারণ পঞ্চদশীতে বিন্দুর আপূরণ ও সংক্ষয় উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ণিমা বা অমাবস্যা কোনটিই স্থায়ী নহে, কারণ পূর্ণিমার পর কলা ক্ষয় হয় এবং অমাবস্যার পর কলার বৃদ্ধি হয়। যাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় তাহা অপূর্ণ ; যাহা প্রকৃতই পূর্ণ তাহার বৃদ্ধিও নাই, হ্রাসও নাই, তাহাই ষোড়শী, তাহাই অমৃত কলা।

"পুরুষে ষোড়শকলেঽস্মিন্ তামাহুরমৃতাং কলাম্।"

এই ষোড়শী অমৃত কলা—ইহাই মৃত্যুর অতীত, পরিবর্তনের অতীত ও কালের অতীত। পঞ্চদশী বিন্দুরূপে কালের আবর্তন হইতে মুক্ত হইয়াও প্রকৃত মুক্ত নহেন। শিব শক্তিকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন ইহা যোগের একটি অবস্থা। ষট্‌চক্র ভেদ হইলে সহস্রদল কমলের বিন্দুতে এই অবস্থার উদয় হয়। এই স্থলে শক্তি পঞ্চদশী অবস্থার অন্তর্গত। কিন্তু শক্তি ষোড়শী অবস্থা তখনই প্রাপ্ত হইতে পারে যখন শিব পরমশিবরূপে তাঁহাকে ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শক্তি শিবের অঙ্ক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পুষ্টি লাভ

করিলে নাভি-মার্গ উন্মুক্ত হয় এবং পুষ্টির প্রকর্ষবিস্থায় নাভি-মার্গ হইতে নির্গত ব্রহ্মনালকে আশ্রয় করিয়া যে কমল শূন্যপথে বিকশিত হয় তাহাতে স্থিতি-লাভ করেন। এদিকে শিব পরম শিবরূপে উন্নীত হন। যে চারিটি অন্তরালবর্তী অবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহাদের নাম ক্রমশঃ এই প্রকার ঃ—

(১) প্রাসাদ। এই অবস্থায় পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি তল্পে শয়ান। ইহা একপার্শ্বগত স্থিতি।

(২) মহাপ্রাসাদ। এই অবস্থায় পুরুষ ও প্রকৃতিতে পরস্পর মিলন-মুদ্রার পূর্বাভাস।

(৩) পরাপ্রাসাদ। ইহা সামান্য মিলন-মুদ্রার অবস্থা।

(৪) প্রাসাদপরা। ইহা বিপরীত মিলনের অবস্থা।

ইহার পরেই ষোড়শী। তখন শিব আর শিব নাই। পূর্ববর্ণিত চারিটি আসনের প্রভাবে শিব শববৎ সুপ্ত অবস্থায় পরিণত এবং চৈতন্য বা শক্তি নাভিদ্বারে বহির্গত হইয়া প্রকাশমান। শক্তি তখন একেলা, শিব তখন জড়। ঐ উন্মুখ শক্তিই তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী।

ষোড়শীর পরাবস্থাই পরা। মহাশক্তি তখন দ্বিভুজা ও সুবর্ণ পীঠে অধিরূঢ়া। অগ্রে ও পৃষ্ঠে উভয় দিকেই জাগৃতি। পঞ্চদশী হইতে ষোড়শী পর্যন্ত শক্তি ছিলেন রক্তবর্ণা, এবার তিনি শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছেন—রক্তবর্ণ আর নাই। ইহার পর মহাপাদুকা—তাহাই চরণ। ষোড়শী ও মহাপাদুকার অন্তরালে ঘোর নাদ বিদ্যমান আছে। ইহাই পর-নাদ। মহাপাদুকার নখ হইতে পরমামৃত নিঃসৃত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিতেছে। মহা-পাদুকার পরে আর কিছুই নাই—আছে একমাত্র সেই অখণ্ড মহাপ্রকাশ। বস্তুতঃ সেই মহাপ্রকাশে প্রবিষ্ট হইবার দ্বারই এই মহাপাদুকা।

(৭)

সমস্ত বিশ্বই চক্র-স্বরূপ। ইহাই শ্রীচক্র। বিন্দু হইতে ইহার আবির্ভাব হয়, আবার বিন্দুতেই ইহার লয় হয়। আবির্ভাবের ক্রম আছে। প্রথমে বিন্দু রেখাতে পরিণত হয়। বস্তুতঃ সরলরেখাই মূল রেখা—বায়ুর বক্র গতিতে এই সরল রেখা বিভিন্ন প্রকার বক্ররেখায় পরিণত হয়। রেখার সংযোগে আয়তন হয়—তাহাদেরও আবার সংযোগ হয়। মোটের উপর বিন্দুর প্রসার হইতেই অনন্তপ্রকার চক্রের উদ্ভব হইয়া থাকে। চক্রের সৃষ্টিও যাহা আর বিশ্ব বা দেহের সৃষ্টিও তাহাই। প্রতি দেবতাই স্বরূপতঃ চিদাত্মক—শুধু ভাবের ভেদে ভেদাভাস জাগে, ভাবভেদ হইতেও চক্রভেদ

হইয়া থাকে। যাহাকে শ্রীচক্র বলা হয় তাহাও ভাবেরই একটি বিশিষ্ট সংস্থান।

বিন্দুই চক্রের মূল। শিব ও শক্তির সামরস্যকে বিন্দু বলে—ইহার নাম রবি অথবা কাম। শিবাংশ সংহারাত্মক অগ্নি এবং শক্ত্যংশ সর্গাত্মক সোম—বিন্দু উভয়ের সামরস্য বা রবি। ইহা স্থিতিরূপ।

আদ্যাশক্তি সর্বতত্ত্বময়ী প্রপঞ্চরূপা, অথচ সর্ব তত্ত্বের অতীত। তিনি নিত্য পরমানন্দরূপ ও চরাচরের বীজস্বরূপ। অহং শিবের স্বরূপ, অহমাকার জ্ঞান বিমর্শ বা শক্তির স্বরূপ। আদ্যাশক্তিই শিবের স্বরূপ-জ্ঞান-প্রকাশের পক্ষে নির্মল দর্পণ স্থানীয়। অহং জ্ঞানই শিবের স্বরূপ জ্ঞান—আদ্যাশক্তিতেই তাহার প্রকাশ হয়। আগমবিদ্‌গণ বলেন, যেমন একজন সুন্দর রাজা স্বাভিমুখে স্থিত স্বচ্ছ দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ঐ প্রতিবিম্বকে যেমন অহং বলিয়া জানিতে পারে তদ্রূপ পরমেশ্বর নিজের অধীন স্বাত্ম শক্তিকে দর্শন করিয়া নিজের স্বরূপ জানিতে পারেন। "আমি পূর্ণ" ইহাই সেই জ্ঞানের স্বরূপ। দর্পণ যেমন সন্নিহিত বস্তুর সম্বন্ধ ব্যতীত নিজের অন্তর্গত প্রতিবিম্ব অবভাসিত করিতে পারে না, তদ্রূপ পরা শক্তিও পরম শিবের সম্বন্ধ ব্যতীত নিজের অন্তঃস্থিত প্রপঞ্চ প্রকটিত করিতে পারেন না। তাই কেবল শিব বা কেবল শক্তি দ্বারা জগতের নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয় না—উভয়ের সহকারিতা চাই। উভয়ের সম্বন্ধ হইতেই সকল তত্ত্বের উদয় হয়। সুতরাং এক হিসাবে চক্রের অবতরণ বিষয়ে কাহারও প্রাধান্য আছে বলা চলে না। সেইজন্য সাংখ্যায়ন শাখাতে কাম ও কামেশ্বরীর সমপ্রধানত্ব বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শিব ও শক্তি একই তত্ত্ব—"শিবশক্তিরিতি হ্যেকং তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ।" তথাপি চক্রাবতারে শক্তিরই প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হয়। যখন সেই পরাশক্তি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্ব সৃষ্টি করেন তখন চক্র সম্ভূত হয়—যে বিশ্ব তাঁহারই মধ্যে অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল তাহা তখন ফুটিয়া উঠে। পরাশক্তিতে সৃষ্টির ইচ্ছার জাগরণ প্রাণীগণের অদৃষ্টগত বিপাকবশতঃ হইয়া থাকে। পরা শক্তির বিশ্বরূপ ধারণ করাই বিশ্বের সৃষ্টি। ইহাই তাঁহার স্ফুরতা। এই সৃষ্টি-ব্যাপারে শিব থাকেন তটস্থ বা উদাসীন। তত্ত্বসকলের সমষ্টিকেই বিশ্ব বলা হয়। শ্রীচক্র এবং অন্যান্য চক্র তত্ত্বসকলেরই সংস্থান ব্যতীত অন্য কিছু নহে—ইহা তত্ত্বাতীত অবস্থা হইতে প্রকটিত হয়। তত্ত্বাতীত সত্তা শান্ত, শিব ও নিষ্ক্রিয়। তাহা হইতে তত্ত্বময় চক্র কি প্রকারে আবির্ভূত হয়? এইখানেই পরা

শক্তির আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরা শক্তির ইচ্ছাই সৃষ্টির মূল। তাই চক্রাবতারে শক্তির প্রাধান্য অঙ্গীকার করিতে হয়।

অতএব পরা শক্তি একদিকে এবং উহার স্ফুরত্তা অপর দিকে। স্ফুরত্তাই সৃষ্টির রূপ। সর্বতত্ত্বময় বিশ্বের সৃষ্টি ; বিশ্বময় পরদেবতা চক্রের আবির্ভাব ও পরা শক্তি কর্তৃক স্বীয় স্ফুরত্তার দর্শন, একই কথা।

এই আবির্ভাবে স্বরূপতঃ ক্রম না থাকিলেও বুদ্ধির দিক দিয়া একটি ক্রম যে প্রকারেই হউক স্বীকার করিতে হয়। এই ক্রমটি আমাদের বর্তমান দৃষ্টি-কোণ হইতে নিম্নলিখিত রূপে প্রদর্শন করা যায়—

(i) তত্ত্বাতীত প্রকাশ বা শিব। ইহা নিরাকার ও শূন্য রূপ, অ।

(ii) দ্বিতীয় অবস্থা শিব-শক্তির সামরস্য। ইহা কাম বা রবি। ইহা অগ্নীষোমাত্মক বিন্দু। শিব=অ এবং শক্তি=হ। উভয়ের সামরস্যই এই বিন্দু।

(iii) তারপর বিন্দুর স্পন্দন বা সংসরণ—ইহার নাম শুক্লবিন্দু ও রক্তবিন্দু।

(iv) পূর্বে কথিত সংসরণ হইতে যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম সংবিৎ। ইহা চিন্ময়ী ও অগ্নীষোমাত্মিকা—ইহার নাম চিৎকলা। অগ্নি-সম্পর্কে যেমন ঘৃত বিগলিত হইয়া বহিতে থাকে তদ্রূপ প্রকাশের সম্বন্ধ বশতঃ পরাশক্তি বা বিমর্শের স্রাব হয়। স্রাব হইলেই লহরী বা তরঙ্গ উঠিয়া থাকে—উহাই উভয় বিন্দুর অন্তরালস্থ হার্ধ কলা।

(v) এই হার্ধ কলাযুক্ত প্রকাশ হইতেই বৈন্দব চক্রের প্রসব হয়। উক্ত প্রকাশকেই কামকলাক্ষর বলে। অতএব বিন্দু হইতেই বৈন্দব চক্র হয় বটে, কিন্তু বিন্দুতে স্পন্দন হওয়া চাই। এই বৈন্দব চক্রই মধ্য ত্রিকোণ অর্থাৎ বিশ্বজননীর নিজ স্থান, যাহা হইতে সমগ্র বিশ্বের আবির্ভাব ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে।

নির্বিশেষ চিন্মাত্রের প্রথম পরিণামই কামকলা রূপ—ইহাই মহাশক্তি মায়ের আবির্ভাব। ইহার পর তাঁহার পট্টাভিষেক অর্থাৎ সকল ভুবন-সাম্রাজ্যের অধিকার বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ (ললিতা সহস্র নাম ভাষ্য)।

যে বিন্দু হইতে বৈন্দব চক্র উৎপন্ন হয় তাহাই পরমাত্মা—তাহাই মহাবিন্দু বা সদাশিব। এই বিন্দুটি বস্তুতঃ পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই তিন মাতৃকার সমষ্টি বা তুরীয় বিন্দু। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া মূল ত্রিকোণ প্রসূত হয়, এইজন্য এই ত্রিকোণকে ত্রিমাতৃকারচিত বলা হয়। মহাবিন্দুতে ত্রিমাতৃকা এক বিন্দুরূপে একীভূত। বৈন্দব চক্রে তাহারা প্রসূত হইয়া পরস্পর পৃথক্

ভাব গ্রহণপূর্বক তিনটি রেখা ভাব প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ হওয়ার ফলে ত্রিকোণরূপে পরিণত হয়। ইহাই বিশ্বযোনি—যাবতীয় তত্ত্ব অর্থাৎ ছত্রিশ তত্ত্বই ইহার লহরীস্বরূপ। এই সকল তত্ত্ব বা সমগ্র বিশ্ব বৈন্দব চক্র হইতেই উদ্ভূত হয়। বৈন্দব চক্র কামকলাক্ষর দ্বারা গঠিত। সুতরাং সকল তত্ত্ব ও চক্রই মূলে কামকলাময়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।